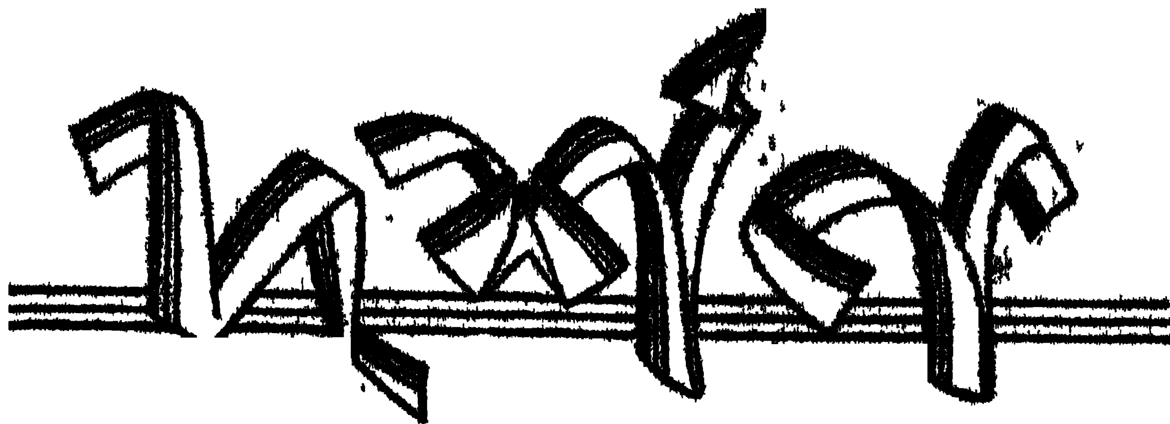


বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্তিক-পৌষ [১৩৭৩ সাল

যুগ্ম-সম্পাদক :

ডঃ শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

সহযোগিতায় :

অধ্যাপক শ্রীঅনাদি কুমার লাহিড়ী

বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৪'০০ মূল্য—১'২৫

প্রকাশ—চৈত্র : ১৩৭৫

[illegible] কার্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্ত্তিক-পৌষ [১৩৭৩ সাল

সূচীপত্র

দর্শন

২০শ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

কার্ত্তিক-পৌষ

১৩৭৩

নিৎসে ও অস্তিবাদ

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক যুগের চিন্তাজগতে যে একটা অব্যবস্থিত (unsettled) ভাব পরিলক্ষিত হয়, তার দার্শনিক রূপ পাওয়া যায় অস্তিবাদের মধ্যে। নিৎসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এই আধুনিক অস্তিবাদের সূচনা বলা যেতে পারে।

নিৎসের এই আলোড়নকারী মতবাদ মূলতঃ হেগেলের দার্শনিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হেগেলীয় দর্শনের মূল হ'ল এক বিশ্বজাগতিক ঐক্য—এই বিশ্বের সর্ব্বত্র বৈচিত্র্যের মধ্যে সমতা এবং সমতার মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। হেগেল বলেছেন যে, বস্তু-জগতে সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কশীল এবং এই বস্তুজগৎ এক ন্যায় বা যুক্তিসম্মত পদ্ধতি (logical system) অনুযায়ী ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

বস্তুজগতের সর্ব্বত্র ন্যায়পদ্ধতি রয়েছে, এবং তার ওপরে চরম ন্যায়পদ্ধতি হিসেবে রয়েছেন, ঈশ্বর বা Absolute.

হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে Schelling বলেছেন "There is an underlying identity of opposites"—হেগেলের মতে চিন্তা এবং বস্তু একই নিয়মের অন্তর্গত এবং ন্যায় ও অধিবস্তুবাদ অভিন্ন। এ সম্বন্ধে Fichte বলেছেন "Thesis, antithesis, and synthesis constitute the formula and secret of all development and all reality." হেগেলীয় দর্শনে দেখা যায় ঈশ্বররূপ এক পরম সম্পর্কশীল পদ্ধতির মধ্যেই সমস্ত বস্তু জগতে বিরাজমান:

"God is the system of relationships in which all things move and have their being and their significance.

নিৎসের বিদ্রোহ যেমন প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে তেমনই নীতিপদ্ধতির বিরুদ্ধে। ঈশ্বরকে চরম পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিতে তিনি রাজি নন। সম্পর্কশীল অধিবস্তুবাদ সম্বন্ধেও তিনি বিশ্বাসী নন।

এ সম্বন্ধে নিৎসের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণবাদী (deterministic) ও নাস্তিকবাদী। নিৎসে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি প্রবৃত্তিগতভাবেই নাস্তিক।

শোপেনহাওয়ারের রচনার দ্বিধাহীন নাস্তিকতা তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। ইচ্ছাশক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপে তিনি মূলতঃ শোপেনহাওয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হ'ন।

অতি অল্প বয়সেই নিৎসে প্রচলিত ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস হারান, এবং অবশিষ্ট জীবন কোন এক নতুন ঈশ্বরের সন্ধানে অতিবাহিত করেন। তাঁর কাল্পনিক ঈশ্বরের নাম ছিল "superman"। এই 'superman' বা অতিমানব হচ্ছে, কর্মশক্তি, বুদ্ধি, গর্ব্ব, আবেগ ও ইচ্ছার সমন্বয়ে গঠিত। 'Superman'-এর বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

"To teach you the superman, Man is something that is to be surpassed....it is man's body, not his soul, that is to be preferred"—(*Thus spake Zarathustra.*)

মানব ও অতিমানবের পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"Man is a rope stretched between the animal and the superman....a rope over an abyss". (*Ibid.*).

নিৎসের মানবিকতা মানুষের সীমাহীন কর্মক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কর্মক্ষমতার বলে মানুষ অতীত প্রতিষ্ঠাকে পেছনে ফেলে রেখে সম্মুখে এগিয়ে যায়। নিৎসে বলেছেন যে মনুষ্য চরিত্রে উত্থান পতন আছে বলেই তার চরিত্র এত প্রীতিপদ। "What is great in man is that he is a bridge and not a goal, what is lovable in man is that he is an overgoing and a downgoing". (*Ibid.*).

নিৎসের দৃষ্টিতে জগতে সৎ এবং অসৎ উভয়ই সমান প্রয়োজনীয়। হিংস্রতা, বিপদ, এবং যুদ্ধ, শান্তি এবং করুণার ন্যায়ই মূল্যবান। মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি, ক্ষমতা এবং আবেগের স্থায়িত্ব। আবেগ না থাকলে মানুষের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। নিৎসে বলেন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার পক্ষে লোভ, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি অপরিহার্য্য। নিৎসের

মতে প্রচলিত ধর্ম (revealed religion) হচ্ছে জীবনের শত্রু এবং মনুষ্য সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতক।

দেখা গেছে যে, প্রচলিত সাধারণ মান (accepted standard) সম্বন্ধে নিৎসের যে সমালোচনা তা নিছক সন্ত্রাসবাদী বা ধ্বংসাত্মক নয়। প্রচলিত ধর্মমত গৃহীত হওয়ার ফলে মানব সমাজে এক বিক্ষুব্ধতার ও গতিহীনতার ভাব এসেছে এবং ইতিহাসের মূল শিক্ষা অস্বীকার করে মানুষ এখনও সেই অপ্রকৃতিস্থ পশুই রয়ে গেছে।

প্রচলিত নীতিবাদ ও সমাজবাদের বিরুদ্ধে নিৎসে শক্তিহীনতার (antivital) অভিযোগ এনেছেন, এই শক্তিহীনতা মানুষকে অতীতের ব্যর্থসীমা লঙ্ঘনে অক্ষম করে।

খৃষ্টধর্মকে এই শক্তিহীন রক্ষণশীলতার সঙ্গে একাত্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জাতীয় ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্দান্ত অশান্ত ভাবকে দমন করে, যে অশান্ততার সৃষ্ট-ফল মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বকে ন্যায় সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অপর পক্ষে দেখা যায় যে, প্রচলিত ধর্ম অশান্ততার বদলে সামঞ্জস্য (conformity) বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং আত্মতুষ্টির ভাবকে (complacency) উৎসাহিত করে।

নিৎসের চরম উদ্দেশ্য ছিল অতিমানবীয় সত্তার ওপর যে অক্ষমতা আরোপ করা হয়েছে তার বিরোধিতা করা, এই উদ্দেশ্য তিনি সুস্পষ্টভাবেই সমন্বয়বাদ (collectivism) এবং একত্ববাদ (individualism) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছেন, কারণ এই বাদগুলি সমগ্র মনুষ্যসমাজের মধ্যে এক মূল সাম্যভাবের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে।

সেইজন্য নিৎসে মনে করেন মানুষের মধ্যে দৈহিক, চিন্তাগত এবং সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ধরে নেওয়া উচিত; শুধু তাই নয়, এই শ্রেণীবিভাগ অপরিহার্যভাবে প্রতিরোধ্য। কারণ কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক প্রতিভাশালী মানুষই অস্তিত্বের উচ্চতম সীমায় পৌঁছবার যোগ্য।

অনন্ত ও চরম সত্য (highest truth or eternity) সম্বন্ধেও নিৎসে কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদী এবং নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন।

শোপেনহাওয়ারের ঈশ্বরবাদ অস্বীকার নিৎসের মানসিকতা ও লক্ষ্যের সঙ্গে মিলেছিল। নিৎসে সঙ্গে মার্কস-এর সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় এই বিষয়ে যে তাঁরা উভয়েই ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষীয় বিতর্কগুলি অস্বীকার করেছেন এবং বিস্তৃত সাংস্কৃতিক বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের সমালোচনা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নিৎসের বিধিবদ্ধ নাস্তিকতা সেইসব অস্তিবাদীদের কাছে আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়েছিল, যাঁরা ঈশ্বরহীন বস্তুবাদের অস্তিত্ব স্থাপনার প্রচেষ্টা করতে চেয়েছিলেন।

নিৎসীয় দর্শন তাঁদের এই ধারণা পোষণে অনুপ্রাণিত করে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস উভয়ই হচ্ছে ঐচ্ছিক দৃষ্টিভঙ্গী। ঈশ্বর যে অস্তিত্বহীন এই ধারণাও পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

নিৎসে বলেন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বিপ্লব ঘটানো কখনই সম্ভব হবে না যতক্ষণ না অতিপ্রাকৃত নিয়মের প্রতি আনুগত্য দমন করা যাবে।

প্রাচীকালের প্লেটোনিজম এবং আধুনিক যুগের খৃষ্টাননীতি মূল্যবোধের অতি প্রাকৃত নিয়মের স্বপক্ষে এক বৃহৎ আন্দোলন চালিয়ে বিজয়ী হয়েছে।

নিৎসে তাঁর তর্কের (dialectic) আঘাতে প্রচলিত খৃষ্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। তিনি বলেন যে, আমরা যদি এক অতিপ্রাকৃত, পরিবর্তনহীন পদার্থকে স্বীকার করে নিই, তাহলে পরিবর্তনশীল জগতের মূল্যহানি হয়ে পড়বে এবং আমরা এক দ্বিধা-বিভক্ত নীতির সম্মুখীন হয়ে পড়বো।

চরম সত্তার অস্তিত্ব (true being)-কে সমাজের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর নীতি-পদ্ধতি এবং মনোবৃত্তির সহিত একাঙ্গিভূত করে তোলা একটা প্রচলিত প্রথায় দাঁড়িয়ে গেছে।

শক্তির ভিত্তি (power basis) প্রকাশ্যভাবে নৈতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর অর্পণ না করে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা নৈতিক মূল্য স্বর্গীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তার ওপর এক বিশ্বজাগতিক রূপ আরোপ করেন।

খৃষ্টধর্মীয় ঈশ্বর বিশ্বাসকে নিৎসে এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে অস্বীকার করেছেন যে, যে হেতু খৃষ্টধর্ম একটি পরিপূর্ণ পদ্ধতি, সেই হেতু সাধারণ মানুষের সংস্কৃতি এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ উনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টধর্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এরই প্রতিবাদ স্বরূপ নিৎসে খৃষ্টধর্মের ওপর আক্রমণ চালান। তিনি খৃষ্টধর্মকে বিলুপ্ত করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন। বিশেষ করে এই ধর্মের কেন্দ্রীয় বস্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর চরম মনো-ভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় এই উক্তিটিতে…"does not that hermit know that God is dead" ? (*Ibid*).

যদিও নিৎসে ঈশ্বরের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেছেন তবুও তিনি এমন এক সত্তাকে স্বীকার করেছিলেন, যার স্থিতি (being) পরিবর্তনের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারে। জরথুষ্ট্র এই পার্থিব জীবনকেই সর্বস্ব বলে তাঁর বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমাদের সমস্ত শক্তি এবং প্রেরণা এই সীমাবদ্ধ পরিবর্তনশীল জগতের প্রতি প্রয়োগ করা উচিত, কারণ এই জগত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ।

অনন্তকাল এবং অস্তিত্ব সম্বন্ধে এটাই হ'ল নিৎসের বিকল্প নীতি। ইচ্ছাশক্তির চরম কার্য হিসেবে তিনি যা বলেছেন তা' হচ্ছে এই যে আত্মাকে উন্মুক্ত বিশ্ব অপেক্ষা সীমাবদ্ধ বিশ্বে স্থাপন করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

নিৎসে বলেন যে সত্যকে আমরা ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে পারি। নিৎসে সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সন্দেহবাদ এবং নৈরাত্ম্যবাদকে পরিপূর্ণতার রূপ দিতে গিয়ে তাকে শূন্যবাদে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে অধিবিদ্যা (metaphysics)-কে অস্বীকার নিৎসের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় নতুন মতবাদের ভূমিকামাত্র। নিৎসের মতে ভাববাদ (idealism) হচ্ছে পলায়নী মনোবৃত্তি সম্পন্ন দর্শন।

সমসাময়িক বস্তুবাদকেও নিৎসে অস্বীকার করেন, কারণ তাঁর ধারণা বস্তুবাদও ভাববাদের মতন পার্থিব জগতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভ্রান্ত অধিবস্তুবাদের শরণাপন্ন হয়েছে। এরা উভয়েই ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে অবহেলা করে, যে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি আমরা জড় ও জীব উভয় জগতেই দেখতে পাই।

অধিবিদ্যাকে নিৎসে যে রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাকে অনন্ত পৌনঃপুনিকতার নীতি (doctrine of eternal recurrence) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নীতির অর্থ হ'ল বর্ত্তমানের সংঘটিত ঘটনাবলী ভবিষ্যতে আরও উন্নত পর্য্যায়ের হয়ে সংঘটিত হবে।

শিল্পকলাকে নিৎসে ধর্ম ও দর্শনের ওপরে স্থান দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে, শিল্পের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বজগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি। শিল্পের মধ্যেই আমরা শক্তির দ্বন্দ্বের সারবস্তুকে উপলব্ধি করতে পারি। নিৎসে বলেন, শিল্প কখনও নৈতিক মান দ্বারা অবদমিত হবে না। শিল্পের একটা নিজস্ব প্রতিরোধ শক্তি থাকা উচিত কারণ শিল্প প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করে।

নিৎসের মতে মানুষের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত, আমাদের নৈতিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের উচিত জগত বহির্ভূত কোন শক্তির আশা না করে, বাস্তব জগতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

নিৎসে মানুষের সমস্ত রকম করুণা, হীনতা, আস্তিকতা ও নিরপত্তা বোধকে দুর্বলতার প্রতীক বলে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

নিৎসের এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় পরবর্ত্তীকালের অস্তিবাদীদের মতবাদের মধ্য দিয়ে। অস্তীবাদীরা দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্রতা অনুযায়ী আবার দুভাগে

বিভক্ত হয়ে যায় : এঁদের একদলকে আস্তিক আর অপর দলকে নাস্তিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।

আস্তিক মনোভাব সম্পন্ন অস্তিবাদিদের মধ্যে Soren Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এবং নাস্তিকদের মধ্যে Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Allert Camus প্রভৃতি বিশিষ্ট চিন্তাবিদেরা আছেন।

অস্তিবাদিদের সম্মুখে দুটি গ্রহণযোগ্য পথ ছিল—একটি ছিল নিৎসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (finite phenomenon) গ্রহণ করা অথবা অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব এবং পরিবর্তনশীল জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সমস্ত প্রকল্প পুনরুদ্ঘাটিত করা। অস্তিবাদিরা প্রচলিত ধারণার বশবর্ত্তী দার্শনিকদের মতবাদ পরিহার করে চিন্তাজগতে আলোড়ন এনেছেন।

অনন্ত-বৈচিত্র্যময় জগত অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে প্রত্যাবর্তন না করে এঁরা সাধারণ মানুষের জীবনের কাছে অবস্থান করেন। অস্তিবাদিরা বিশ্বাসের বিপন্নতা-বোধকে একটা কৃত্রিমরূপ দিয়েছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক গঠনকে তীক্ষ্ণ পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টায় আছেন।

নিৎসের অধিবস্তুবাদ সম্বন্ধীয় বৈপ্লবিক মতবাদকে অস্তিবাদিরা আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন, ঈশ্বর এবং মানুষই হয়েছে তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রস্থানীয় বিষয় বস্তু।

অধিবস্তুবাদকে পুনর্গঠিত করা উচিত অথবা তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত তা নিয়ে অস্তিবাদিদের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব রয়ে গেছে, তাছাড়া অতি প্রকৃতিকে অতিপ্রাকৃত ঈশ্বর-এর সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া হবে, না এর জন্যে পার্থিব জগতে বিরামহীন সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে সে সম্পর্কেও বহু বিতর্ক রয়েছে।

অস্তিবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে দর্শনকে উচ্চতম পর্য্যায়ে উঠতে হলে অস্তিত্ব সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাধারায় যেতে হবে না। দর্শনের প্রকৃতরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক পদ্ধতি, বিশ্বজাগতিক অর্থ, যুক্তির গঠন প্রভৃতি বাহুল্য মাত্র।

এ সম্বন্ধে Roberts বলেছেন যে অস্তিবাদিদের কাছে অস্তিত্বের প্রকৃত অর্থ বলতে বোঝায় একজন ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব। মানুষ এবং জগৎ এই দুইয়ের মধ্যেকার সংযোগ সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে অপরিহার্য্যভাবে অস্তিবাদিদের মধ্যে বিভিন্ন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

অস্তিবাদিরা ধর্মভাব দ্বারা প্রণোদিত হোন আর নাই হোন, তাঁরা স্বভাবতঃই মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুপমত্ব (uniqueness) রক্ষা করে চলার চেষ্টা করেন।

শুধু তাই নয়, অস্তিবাদিরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিরোধ করাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন এই কারণে যে এরা নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিবাদ এবং ব্যবহারিক দর্শনের কার্য্যকারিতার দ্বারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত হয়। চিন্তাশীলতার দিক দিয়ে নিৎসে ও কির্কেগার্ড-এর মধ্যেকার সাদৃশ্য ও প্রভেদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সংস্কৃতি ও নৈতিক ধারণা সম্বন্ধে নিৎসের যে মতবাদ, তা পরিচিত কির্কিগার্ডীয়ন ও শোপেনহাওরীয় মতবাদ থেকে ভিন্ন।

একদিক দিয়ে কির্কেগার্ডের মানবিকতাকে অধিকতর নরমপন্থী বলা যেতে পারে, কারণ তিনি মানবিক অধিকার-এর ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস রেখেও, তার ওপরে স্বর্গীয় বিধানের কার্য্যকারিতা ধরে নিয়েছেন। পরিবর্ত্তনশীল জগতে প্রত্যক্ষীভূত অসাম্যতা সত্ত্বেও যে একটি অপরিহার্য্য সাম্যতা পরিলক্ষিত হয়, তারই মধ্যে অনন্তকালের চরম শ্রেষ্ঠত্ব জড়িয়ে রয়েছে বলে কির্কেগার্ড মনে করেন।

এ ক্ষেত্রেও নিৎসে এক কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদী ও নাস্তিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। নিৎসের সঙ্গে কির্কেগার্ড এর সবচেয়ে প্রভেদ দেখা যায় এই বিষয় যে কির্কেগার্ড মনে করেন চরম কল্যাণ (highest good) প্রতিটি মানুষের প্রচেষ্টালব্ধ বস্তু এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি মানুষেরই কর্ত্তব্য রয়েছে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করা। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে কির্কেগার্ড খৃষ্টানধর্ম এবং খৃষ্টান জগৎ (Christianity and Christendom) এর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন।

কিৰ্কেগার্ড বলেছেন যে খৃষ্টানধর্ম এবং অস্তিকতা টিকে থাকা সম্ভব নয়, যদি না তারা খৃষ্টান জগতের বিকৃতি এবং দুর্ব্বলতা থেকে নিজেদের ছিন্ন না করে। এই নিয়ে অবশ্য অস্তিবাদিদের মধ্যে যথেষ্ট মত পার্থক্য আছে।

হেগেলীয়দের সম্বন্ধে কিৰ্কেগার্ড বলেছেন যে আমরা নিজেদের ঈশ্বররূপে কল্পনা না করে যদি মানুষ হিসেবে কল্পনা করে সন্তুষ্ট থাকি তা হ'লেই ভাল হয়। নিৎসে ঈশ্বরকে মৃত বলে ঘোষণা করলেও কিৰ্কেগার্ড অতটা নাস্তিক হ'তে পারেন নি, তিনি বলেছেন ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই ("God is, but does not exist")। অসীম অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুর প্রতি অস্তিত্ব আরোপ করা যায় না। অস্তিত্বের অর্থই হ'ল পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া।

এ ক্ষেত্রেও অস্তিত্বশীল চিন্তাধারার সঙ্গে স্বর্গীয় সত্বার সম্পর্ক স্থাপন করা নিয়ে অস্তিবাদিদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বিশুদ্ধচিন্তা অস্তিবাদিদের কাছে এক উদ্ভট ব্যাপার, কারণ তাঁরা বলেন অস্তিত্ব-

সম্পন্ন মানুষই চিন্তা করে থাকে, চিন্তাশক্তি যদি অস্তিত্বের বাইরে হয়, তাহ'লে মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকা অসম্ভব।

অস্তিবাদিরা বলেন বস্তু সত্তা আলো নয়, অস্তিত্ব আলো, ব্যক্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে বিশ্বজগতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায়, ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অসন্তোষের ভাব জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

কামু মনে করেন মানুষ ও বিশ্বজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক এক উদ্ভট বস্তু। ঈশ্বর মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বস্তু জগতের সৃষ্টি করেছেন, এই খৃষ্টান বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও কামু প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অস্তিবাদি দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তা জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। আধুনিক অনেক মানুষের মনে (বিশেষ করে দ্বিতীয় মহা যুদ্ধোত্তর তরুণ সম্প্রদায়ের ওপর) এর প্রভাব সুদূর বিস্তৃত, অপর পক্ষে এর বিরূপ সমালোচনারও অভাব নেই। ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণার মধ্যে যে শূন্যবাদিতার প্রকাশ সে সম্বন্ধে হাইডেগার বলেছেন যে শূন্যবাদ সাম্প্রতিক কালের কয়েকজন দার্শনিকের আবিষ্কার নয়, অপর পক্ষে এর মধ্যে আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রকাশ রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি যেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস অস্বীকার করছে, সেটা হচ্ছে এই মূল বিপ্লবের আনুষঙ্গিক বিষয়। এ সম্বন্ধে সার্ত বলেন যে ঈশ্বরহীন জগতে মানুষ এক সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে, প্রতিমুহূর্তে শুধু মানুষকেই আবিষ্কার করতে বাধ্য হবে।

অস্তিবাদের বিপক্ষে যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন তাঁদের বক্তব্য হ'ল এই যে অস্তিবাদ কোন দার্শনিক পদ্ধতিই নয়। কিছু ভ্রান্ত, বীতশ্রদ্ধ মানুষের বিকার প্রকাশ পেয়েছে, এই অস্তিবাদের মধ্যে। ঈশ্বর, ধর্ম, বিশ্বাস এগুলিকে অস্বীকার করে এরা এক উদ্দেশ্যহীন বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রচার করে চলেছে। চিন্তাধারা এখানে স্থূল হ'তে স্থূলতর, বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে গিয়ে এরা পরোক্ষভাবে বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে।

মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে কেবলমাত্র স্থূলবস্তুবাদের মধ্যেই তার চিন্তা শক্তি আবদ্ধ থাকে না।

অস্তিবাদ মানুষের মনের গভীরের বিভিন্ন ভীতিজনক অলিন্দ যেমন পাপ, আতঙ্ক, নৈরাশ্য, শূন্যতা প্রভৃতি উদ্‌ঘাটিত বা আবিষ্কৃত করে থাকে। এই কারণেই আস্তিকবাদের বিপক্ষে অস্তিবাদের এই পন্থা অনেকের কাছে বিকৃত এবং দুর্ব্বলতার প্রতীক বলে অনুমিত হয়।

অস্তিবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের কঠোর সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। অস্তিবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে Gabriel বলেছেন যে ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে অস্তিবাদের যে

বিতর্ক তা অতিলৌকিক ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধীয় বিতর্কের আরও অগ্রসরমান ভূমিকা। অস্তিবাদ সম্বন্ধে Roberts বলেছেন যে নৈরাশ্যবাদ সম্বন্ধে অস্তিবাদিদের যে বিশ্লেষণ তা নৈরাশ্যবাদের মধ্যেই পুনঃ প্রবেশ করেছে। আবার অস্তিবাদকে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের দুঃস্বপ্নের রূপ বলেও অভিহিত করা হয়েছে ("Existentialism is the formulation of Europe's wartime nightmare") অপর পক্ষে, অস্তিবাদের সমর্থকরা বলেন যে অস্তিবাদ আধুনিক যুগের বিকেন্দ্রিকতা (disintegration) এবং ভীষণতা (violence) জড়িত শুধুমাত্র এক অযৌক্তিক উন্মাদনাময় বহিঃপ্রকাশ নয়, এ হচ্ছে মনুষ্যে অভিজ্ঞতার আবশ্যিক অধ্যায়ের এক সমসাময়িক নবজাগরণ। এই জাগরণের উৎপত্তি আদর্শগত সংঘর্ষ থেকে, যে আদর্শ ইতিহাসের স্থির স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হয়েছে।

অস্তিবাদকে আধুনিক মানুষের মানসিক বিকৃতির প্রকাশ বলে অভিহিত করলেও এ কথা বলা যায় যে, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অস্তিবাদের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়, তবুও এ কথা বলা চলে যে এর আবির্ভাব আকস্মিকভাবে হয় নি। অস্তিবাদি ছাড়া অন্যান্য দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যেও এর অল্প বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়।

Scheling-এর পরবর্তী লেখায় অস্তিবাদের সুর পাওয়া যায়। জর্জ সান্তায়ানার দর্শনেও অস্তিবাদের ভাব ফুটে উঠেছে যখন তিনি বলেছেন :—

"This world is contingency and absurdity incarnate, the oddest of possibilities masquerading momentarily as a fact".

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানুষের মনে অতিলৌকিক সত্ত্বার প্রতি মধ্যযুগীয় অন্ধসংস্কার বা বিশ্বাস আর নেই। বিভিন্ন দিক দিয়ে সামাজিক, অর্থ নৈতিক মানসিক বিপর্য্যয় তার চিন্তাধারাকে ভিন্ন পথে চালিত করতে বাধ্য করেছে। অন্ধবিশ্বাস বা সংস্কারের মধ্যে কোন সমস্যার সমাধান না পেয়ে সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে, কিন্তু এই বিদ্রোহের মধ্যেও তার পক্ষে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি। তাই তার বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত চিন্তাধারা বস্তুজগতের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে জীবনের বিভিন্ন বিপর্য্যয়ের মীমাংসার প্রচেষ্টায় আছে।

অস্তিবাদকে যদি মানসিক বিকৃতির পরিচায়ক বলে ধরে নেওয়া যায় তা'হলে বলা যেতে পারে যে এর জন্য শুধু অস্তিবাদেই দায়ী নয়—এর জন্য দায়ী আধুনিক যুগের মানুষের মানসিক গতি-প্রকৃতি, অস্তিবাদ যার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণ*

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ এই লোকপাবন মহাপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জগতে অসীমের লীলাপথে,
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।

কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠের মতো তীর্থভূমির কথা বাদ দিলেও বাঙালীর তথা বিশ্ববাসীর নূতন মানসতীর্থ শ্রীরামকৃষ্ণজীবন ও বাণীসংগ্রহ। উনিশ শতকের চিন্তানায়কদের মধ্যে উপলব্ধির মৌলিকতায় ও অধ্যাত্ম-আদর্শের পরমতম প্রকাশে শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের অনন্য ব্যক্তিত্বই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বের প্রধানতম ঈশ্বরানুসন্ধানের পন্থাগুলি একত্র সম্মিলিত। আর্য, ইসলাম, খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিকতার ত্রিবেণী-সংগম ঘটেছিল দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে। আবার বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, ব্রাহ্ম সব সাধনার ধারাপ্রবাহ এসে মিশেছিল ভারতচেতনার মহাসমুদ্রোপম শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যক্তিত্বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক মঠ ও মিশন বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসের অতল গভীরতার কিছুটা আভাস মেলে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসরূপ নূতন তীর্থ ভারতের বিশাল অতীতের ব্যঞ্জনাময়, আবার সে তীর্থই বিশ্বমানবের চির-অন্বিষ্ট সত্যোপলব্ধির সংকেতরূপে আগামী দিনের বার্তাবাহী। শ্রীরামকৃষ্ণে প্রাচীন ভারতের প্রাণসত্যের পুনরুজ্জীবন, সেই প্রাণসত্যেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিষ্ঠা।

রামমোহন থেকে রামকৃষ্ণ অবধি জাগরণ-পর্ব বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই যা আমাদের

---

* লেখকের অনুমত্যনুসারে তাঁহার "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য" গ্রন্থের শেষ অধ্যায় হইতে গৃহীত।

বিমুগ্ধ হৃদয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তা এ যুগের বাঙালীমানসের ভারতমুখীনতা। পরবর্তীকালে বাঙালীয়ানার প্রতি আমাদের প্রবণতা যতই বাড়ুক, ভারত-সাধনার মূল-মন্ত্রটি সেই সময় থেকেই জাতীয়মানসে সঞ্চারিত। রামমোহন যেমন ভারতীয় দর্শনের প্রধান সূত্রটি গ্রহণ করেছেন বেদান্ত থেকে, শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি ভক্তি-সাধনার বিচিত্র পন্থার অভিযাত্রী হয়েও শেষ অবধি অদ্বৈতবাদের অধিষ্ঠানভূমিতেই আধ্যাত্মিকতার পরম উত্তরণ সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত করেছেন। বেদান্তের অদ্বৈতবাদই ভারতমনীষার তুঙ্গতম প্রকাশ—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাগীরথী যে উৎসের ধারাবাহী।

বেদান্তবাদী রামমোহনের চিন্তাধারার অন্যতম মূল প্রেরণা 'মহানির্বাণতন্ত্র'। তন্ত্র-সাধনা-অবলম্বনেই শ্রীরামকৃষ্ণও অদ্বৈতবাদের অনন্ত বিস্তারে উপনীত। এদিক থেকে আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালীর মনন ও সাহিত্য তন্ত্র-ঐতিহ্যে অনেক পরিমাণে লালিত। কিন্তু রামমোহন বা তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদকে কখনোই গ্রহণ করেন নি। তাই, আধুনিক ভারত-মনীষার পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা ও সাহিত্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আধুনিক যুগের যে সব সমালোচক রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি প্রগতিবাদের সপক্ষে যুক্তিস্থাপন উপলক্ষে তাঁদের অধ্যাত্মপ্রেরণার কথা বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র বিজ্ঞান বা মানবিকতার কষ্টিপাথরে উনিশ শতকের চিন্তাধারার সার্থকতা বিচার করতে যান, তাঁরা উনিশ শতকের একটি মৌল সত্য বিস্মৃত হন। ইংরেজ-রাজত্বে পরাধীনতার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক ছিল ভারতীয় জীবনবোধ সম্বন্ধে সংশয় ও অবজ্ঞার মনোভাব যে মনোভাবের আংশিক প্রতিফলন ডিরোজিও ও তাঁর তরুণ শিষ্যবৃন্দের আলাপ-আলোচনায় প্রকাশ পেত, সেই মনোভাবেরই আর একটি দিক দেখি রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের মননে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কুণ্ঠিত মনোভাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মই নেই যা আচার-অনুষ্ঠানের বা জাতীয় সংস্কারের দ্বারা লালিত-পালিত নয়। স্বদেশীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বর্জন করে বিশ্বধর্মস্থাপনের প্রয়াস কোনো দেশে বা কালে যদি সম্ভবও হয়, তাহলে তা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পক্ষেই কল্যাণকর হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতি, সমাজ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির দ্বারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বিশ্বজনীনতায় উপনীত হওয়া সম্ভব এবং কল্যাণকর। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসাধনা সেই জাতীয় সংস্কৃতির বিশাল পটভূমিকে স্বীকরণের দ্বারাই বিশ্বমানবের অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানের দিশারী হয়ে উঠেছে। এর দ্বারাই পরবর্তী যুগে বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ের অধ্যাত্ম-পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছিল।

সমসাময়িক আদি, ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশাল হিন্দুধর্ম ও সমাজের

পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের প্রত্যাশা করেছিলেন। সে রূপান্তর হিন্দুচেতনার মর্মমূল থেকে সঙ্ঘটিত না হলে বহিরঙ্গ সংস্কার সমকালীন উত্তেজনার যতই সহায়ক হোক, স্থায়ী প্রভাব কিছুতেই রাখতে পারে না। এক হিসাবে রামমোহন—বিদ্যাসাগর—কেশবচন্দ্রের সংস্কার-প্রচেষ্টা তাই হিন্দুসমাজের বহিরঙ্গে কিছুটা রেখাপাত করলেও এর মূল চিন্তাধারাকে আজও বিশেষ স্পর্শ করে নি। এর দ্বারা হিন্দুসমাজ যে অজর, অমর বা অপরিবর্তনীয়—এমন কোনো দাবিই করছি না। কিন্তু জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে প্রেরণাসঞ্চার করতে না পারলে কোনো সংস্কারপ্রচেষ্টাই যে বিপ্লবের দাবি করতে পারে না, একথাই আমাদের আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একদিকে ভারতীয় অধ্যাত্ম-চেতনা আর একদিকে য়ুরোপীয় রাজনৈতিক চেতনা—এ দুয়ের প্রভাবে আধুনিক ভারতবাসীর মননভূমি গড়ে উঠেছে। প্রথম ক্ষেত্রে সেই অধ্যাত্ম-চেতনার মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মননে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চেতনার সার্থক সূচনা রাজা রামমোহনের অগ্রগামিতায়। আজকের ভারতবাসী তাই এ দুই মহাপুরুষের কাছেই তার বর্তমান জীবনবোধের ক্ষেত্রে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাসারে সবচেয়ে বেশী ঋণী।

য়ুরোপীয় মানবিকতাবোধের আদর্শ এদেশে রামমোহন, ডিরোজিও, ইয়ং বেঙ্গলগোষ্ঠী, পজিটিভিস্‌ম-প্রচারক রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখদের চিন্তা ও রচনার মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও পুরোপুরি নিরীশ্বর কোনো মতাদর্শই এদেশের শিক্ষিত সমাজে দানা বাঁধতে পারে নি। বিদ্যাসাগরের মানবিকতার আদর্শ ঈশ্বরজিজ্ঞাসার সঙ্গে যুক্ত না হলেও শুধুমাত্র য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবজাত নয়। বঙ্কিম-মনীষায় ধ্রুববাদের সঙ্গে গীতার কর্ম-জ্ঞান এবং পুরাণের ভক্তিবাদের আদর্শ এসে মিশেছে। সচেতন পঠনপাঠনের দ্বারা উনিশ শতকের অনুসন্ধানীরা যখন ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বিতর্করত তখনই লোকলোচনের অন্তরালে শ্রীরামকৃষ্ণের নীরব সাধনায় সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধির নবরূপায়ণ।[১] ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনা যে মানবিকচেতনারই পূর্ণপ্রকাশ তার প্রমাণস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ সেবাব্রত গ্রহণ।

প্রসঙ্গটি অল্প-বিস্তর পরিচিত হলেও এ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের ভাষায় আর একবার স্মরণীয়—"...ঠাকুর কোন একদিন অপরাহ্নে দিব্যভাবে আপনমনে

১। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ: প্রণবরঞ্জন ঘোষ: 'শ্রীরামকৃষ্ণ: যুগ, জীবন ও সাহিত্য—অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কহিতেছেন, (কাছে নরেন্দ্রনাথ ও আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না,) 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবপূজন। দুঃশালা, জীবে দয়া, এত অহঙ্কার ? সৃষ্ট জীব তুই, তোরে কে দয়া করে তার ঠিক নাই, তুই আবার জীবে দয়া করবি ?' নিস্তব্ধ, পরে—'না না জীবের সেবা,' ক্ষণপরে আবার বললেন,—'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা! তবে ত হবে ?' একটা কথা আছে, যার যেমন মন, তার তেমন ধন। নূতন ভাব শুনে আমি হতভম্ব কিন্তু ধীমান নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া কহিলেন, ভাগ্যে ভাই, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এসেছিলেন, তাই আজ নূতন আলোক পেলাম। মনে রাখ, যদি বাঁচি, আর প্রভু কৃপা করেন, এই মহাবাক্যটি কার্যে পরিণত করতে পারলে ধন্য বোধ করব।"[১]

এই সেবাধর্মস্থাপনের দ্বারাই আধুনিক মানবিকতাবোধের সঙ্গে সর্ববস্তুতে ব্রহ্মোপলব্ধির ভারতীয় আদর্শ এসে মিলিত হয়েছে। প্রাচীন প্রাচী ও নবীন প্রতীচির ভাবসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা ও মনীষার দান এদিক থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমসাময়িক কেশবচন্দ্রপ্রমুখ সংস্কারকদের সমাজ-চেতনতার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানবিকতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাই অনেক বেশী পরিমাণে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিজস্ব প্রকাশরূপে প্রতিভাত।

রামমোহন বা বিদ্যাসাগর যে অনেকটা য়ুরোপীয় মননের প্রভাবেই বেদান্ত সম্বন্ধে কিছুটা নিরুৎসাহ হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাই মানবজীবনে বেদান্তের সর্বময় প্রয়োগের আদর্শের দিক থেকেও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বেদান্ত-প্রণোদিত নর-নারায়ণ-বাদ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের একান্ত প্রয়োজনীয় ভিত্তি।

বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন (বা প্রচার) নামকরণটি থেকে অনেকেই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রভাবেই বিবেকানন্দের সেবা-ধর্মমূলক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠা ও সেবাধর্মের ইঙ্গিত বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-আদেশে ও প্রভাবেই করেছিলেন, যে শ্রীরামকৃষ্ণ যীশু-ভক্ত হলেও মিশনরীদের সঙ্ঘ বা কাজকর্মের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন নি। তবে বিবেকানন্দ নিজে মিশনরী কলেজ জেনারেল এসেম্ব্লির ছাত্র, Imitation of Christ-এর অনুবাদক এবং যীশুখ্রীষ্টের অনুরাগী ভক্ত। সেদিক থেকে মিশনরীদের ভাবধারার কিছু প্রভাব তাঁর জীবনে, মননে, কর্মক্ষেত্রে থাকা অসম্ভব নয়—তাকে অতিরঞ্জিত করে একমাত্র প্রভাব মনে করাই ভুল। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'র আদর্শ ছাড়াও ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের প্রভাব বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় অনেক পরিমাণে সক্রিয় ছিল। রোমান ক্যাথলিক

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত (অনুশীলন) ২য় সংস্করণ পৃঃ ১৩৩।

মঠ অপেক্ষা বৌদ্ধ মঠের প্রভাবই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে বেশী ক্রিয়াশীল। আবার প্রথমবার পাশ্চাত্য-পরিক্রমার পর তিনি যখন রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নিয়মাবলী প্রণয়নে সচেষ্ট, তখন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে মতপার্থক্য উপলক্ষ্যে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—

স্বামী যোগানন্দ। 'তোমার এসব বিদেশীভাবে করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল ?'

স্বামীজী। 'তুই কি করে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব না ? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস ? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব। ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তন করতে কখনও উপদেশ দেন নি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয় নি।'[১]

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্জন পঞ্চবটীমূলে সাধনা কেমন করে শাখাপল্লববিস্তারে বিশ্বতোমুখী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, তারই নিদর্শনস্বরূপ বিবেকানন্দের পরিকল্পনায় 'রামকৃষ্ণ মিশনে'র ভাববীজটির উল্লেখ করা হল। অধ্যাত্ম-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারংবার দেখা দিয়েছে—বুদ্ধ, শংকর বা চৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী প্রভাব আমাদের সুপরিচিত কাহিনী। ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীবদ্ধতা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন মানস-স্তরের সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ইতিবৃত্ত আমাদের অধ্যাত্মচেতনার প্রত্যক্ষ সত্যকে আর একবার প্রমাণ করেছে। একে শুধু হিন্দুয়ানির পুনরভ্যুত্থান বললে আংশিক সত্য বলা হয়, আসলে উনিশ শতকের ধর্মজিজ্ঞাসার একটি পূর্ণাঙ্গ উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ও সাধনায়। এ জিজ্ঞাসার সমাধান সে-যুগে যে কতো প্রয়োজনীয় ছিল তা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের জীবনী ও সাহিত্যপাঠেই উপলব্ধি করা যায়। জাতীয় প্রাণসত্যের মূলকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েই আমাদের বহুমুখী উন্নতিসাধন সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় ভারতবর্ষের জাতীয়প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

উনিশ শতকের ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার কলরোলে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের দল যে আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমরা যতটা জানি, ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শবর্জিত অথচ ভারতের চিরন্তন ধ্যান-ধারণার আশ্রয়ে লালিত সাধারণ

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : স্বামী-শিষ্য সংবাদ পৃঃ ৬২-৬৩।

মানুষের কথা আমরা ততটা জানি না। কামারপুকুরের পল্লী অঞ্চল থেকে সামান্যতম লেখাপড়া-জানা কিশোর গদাধর যেদিন বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা শহরে এসেছিলেন, সেদিন তাঁর অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতে কলকাতার আধুনিকতা কি রকম ঠেকেছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে এই কলকাতার সেরা জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ঘটেছে। এই তথাকথিত শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সরল ব্রাহ্মণের উপলব্ধিময় বাণীর দ্বারা তাঁরা অভিভূত ও প্রভাবিত হয়েছেন। সে জন্য কোনো অলৌকিক শক্তির অভিমান শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল না। তিনি অনেক 'পড়েন'নি বটে, কিন্তু আবাল্য ভারতের অধ্যাত্মসাধনার বহুবিচিত্র পন্থাগুলির কথা কীর্তন, যাত্রা, কথকতা, শাস্ত্রচর্চা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির মাধ্যমে 'শুনেছেন'। এই শ্রুতিলব্ধ বিদ্যা কেবল অক্ষরে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর জীবনসাধনায় প্রতিটি ঈশ্বরলাভের পন্থা তিনি যাচাই করে দেখেছেন, তারই ফলে একদিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—'যতমত তত পথ।'

বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'সাধকভাব' খণ্ডে তাঁর গুরু ও আরাধ্য এই মহামানবের বহুমুখী সাধনার বিস্তৃত পরিচয়দানপ্রসঙ্গে লিখেছেন—"সর্বমতের সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি ও সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষসকল অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে কতদূর সহায়তা করিবে তাহা স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে! প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তি সকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের ঐ প্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির

সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে।”[১]

বেদান্ত-ভিত্তিক এই তিন মতবাদ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সারদানন্দজী তাঁর কয়েকটি উক্তি সমাবেশ করেছেন—“অদ্বৈতবাদ শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।” “মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়ঃ তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য— চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।” “বিষয়বুদ্ধি-প্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তনাদি প্রশস্ত।”[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত অবলম্বনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদান্তচিন্তার আরো কিছু উদাহরণ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

‘বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ ‘আমি ভক্ত’ এই অভিমান থাকে, ততক্ষণেই ঈশ্বরের রূপদর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের আমি অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।’[৩]

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাকার নিরাকার প্রসঙ্গ আলোচনাকালে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য-সাধনে তাঁর অপূর্ব উপমা—

“তিনি সাকার আবার নিরাকার। কি রকম জান ? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূল-কিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার (মহেন্দ্রলাল সরকার)। সূর্য উঠলে বরফ গলে জল হয়; আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’ এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ-টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। কী তিনি মুখে বলা যায় না! কে বলবে ? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর ‘আমি’ খুঁজে পান না! তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না।

১, ২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : সাধকভাব পৃঃ ৪০৭-৪০৯।

৩ কথামৃত (১ম) ১৮৮২, ২৮শে অক্টোবরের দিনলিপি।

তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র ; জ্ঞান সূর্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না। সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই। জ্ঞান সূর্যেই বরফ গলে যাবে ;—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরেই রইল।"[১]

কালী ও ব্রহ্ম—শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে অভেদ। নিষ্ক্রিয় সত্তা ব্রহ্ম, সক্রিয় রূপে তিনিই কালী।

"কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দ পোয়া কেন ? দূরে বলে। দূরে বলে সূর্য ছোট দেখায় ! কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন ? সেও দূরে বলে। যেমন দীঘির জল দূর থেকে সবুজ, নীল বা কালো বর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে করে জল তুলে দেখ, কোন রঙ নাই।

তাই বলছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তার কি স্বরূপ তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য। ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।"[১]

বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকে তিনি যে মূলতঃ অদ্বৈতবাদী একথা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে

১ কথামৃত (১ম) ১৮৮৫, ২২শে অক্টোবরের দিনলিপি।

১ কথামৃত (১ম) ১৮৮২, ২৮শে অক্টোবরের দিনলিপি। ...'বেদান্ত বলে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি পৃথক পদার্থ নহে। একই পদার্থ কখন পুরুষভাবে এবং কখনও বা প্রকৃতিভাবে থাকে। —বিষয়টি আলোচনাপ্রসঙ্গে সমীপাগত তরুণেরা বুঝতে পারছে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন—সেটা কি রকম জানিস ? যেমন সাপটা কখন চলচে, আবার কখন বা স্থির হয়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হয়ে আছে তখন হল পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হয়ে রয়েছে। আর যখন সাপটা চলচে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে কাজ করচে।'

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ : গুরুভাব : উত্তরার্ধ পৃঃ ১১২]

এক্ষেত্রেও স্তরভেদ আছে। 'কথামৃতে'র উক্তি-সংগ্রহে অনেক জায়গায় দেখি অদ্বৈতজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে তিনি দু'ধরনের পার্থক্য করেছেন—'জ্ঞানী' ও 'বিজ্ঞানী'।

ব্রহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি। অগ্নি ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভাবতে হয়, আর দাহিকা শক্তি ভাবলেই অগ্নি ভাবতে হয়।

"কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বশিষ্ঠ শতপুত্রশোকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটি আহরণ ক'রে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।"

মণি—অজ্ঞান জ্ঞান দুই ফেলে দেয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন।

"দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ আছে, তার দুঃখ বোধ আছে; যার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধ আছে; যার শুচি বোধ আছে, তার অশুচি বোধ আছে; যার আমি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

"বিজ্ঞান—কি না তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"[১]

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী, তিনি আপ্তসার—'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী, যেমন শুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি পুঁছে ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়।"[২]

"ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার সাকার দুইই লয়—অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ

১ কথামৃত (৩য়): ১৮৮৩, ৯ই সেপ্টেম্বরের দিনলিপি।
২ কথামৃত (৩য়): ১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর দিনলিপি।

করে। ভক্তি-হিমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়। আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে আবার যেমন জল তেম্নি হয়।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্যাখ্যাত 'জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী' প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই দু'একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সাধারণত অদ্বৈতজ্ঞান লাভকেই আমরা সাধনার শেষকথা বলে জানি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-দৃষ্টিতে শুধু জ্ঞানলাভ নয়, সেই জ্ঞানালোকে সমগ্র জগৎসত্যকে সেই এক ব্রহ্মসত্যের প্রকাশরূপে উপলব্ধি করা আরও উন্নত স্তরের কথা। কেবল নিজের মুক্তির জন্য সাধনা— আমটি খেয়ে মুখটি মুছে ফেলার মতো, কিন্তু নিজে খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো, নিজে মুক্ত হওয়া এবং বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য অগ্রসর হওয়া—এ নিশ্চয় আরো উচ্চস্তরের সত্য। এই 'বিজ্ঞানী'র আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযান-সাধনার প্রজ্ঞা ও করুণার মিলনের আদর্শ তুলনীয়।

সমগ্র সৃষ্টিকে ব্রহ্মসত্যের প্রকাশরূপে উপলব্ধির এই আদর্শের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতসাধনাকে জগৎকল্যাণে নিয়োজিত করার মূলসূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— "অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি। ফলে ঐরূপে উহা লাভ করিতে যাইয়া জগৎ-সংসার ও তন্মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদিগের উপরে ঘৃণার উদয় হইয়া সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ

১ কথামৃত (৪র্থ): ১৮৮৫, ১৪ই জুলাইয়ের দিনলিপি।

হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।”[১]

জ্ঞানযোগের এই নব-বিশ্লেষণাত্মক প্রয়োগ ছাড়াও ভক্তি, কর্ম, রাজযোগের ক্ষেত্রেও স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বিশেষ সার্থকতা দেখিয়েছেন—“ঠাকুরের ঐ কথায় ভক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তিলাভ সাধকের পক্ষে সুদূর-পরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও ঐকথায় বিশেষ আলোক পাইবে। কারণ কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবারূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহার লক্ষ্যে আশু পৌছাইবে, একথা বলিতে হইবে না।”[২]

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপদেশাত্মক গল্পসমূহের অন্তর্নিহিত মর্মব্যাখ্যায় স্বামীজীর নৈপুণ্য আরো বহু ক্ষেত্রেই প্রকাশিত। সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত’ বইখানি পড়তে পড়তে এ জাতীয় প্রসঙ্গের একটি মূল্যবান উপকরণ চোখে পড়ল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যাঁরা অনুরাগী তাঁরা এই উপকরণটির জন্য ‘সান্ন্যালমশায়ে’র কাছে চিরঋণী থাকবেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে এই উপকরণটির ব্যবহার কোথাও দেখি নি বলে একটু দীর্ঘ হলেও পাঠকদের কাছে সমগ্রভাবেই বিষয়টি উদ্ধৃত করছি।

“ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ দর্শন”[১]

স্বামী বিবেকানন্দ কৃত

[প্রভুর লীলাবসানের কিছুদিন পরে হিমালয়ে তপস্যা করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গাধরকে সঙ্গে লইয়া আলমোড়ায় গমনকালে এক পান্থশালায় বসিয়া নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গঙ্গাধরের (স্বামী অখণ্ডানন্দ) খাতাতে তাঁহার সিদ্ধান্তটি বিবৃত করেন। আলমোড়ায় শরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) ও আমাকে দেখাইলে আমি উহা লিখিয়া লই ; এবং কবচের মত যত্ন করিয়া রাখি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ লিখিবার কালে শরচ্চন্দ্রকে দিই, এবং

১, ২ লীলাপ্রসঙ্গ : দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ : ৪র্থ সং পৃঃ ২৬৪।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত (অনুশীলন) : শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল : ২য় সং পৃঃ ২৫৯।

তাহারও ইচ্ছা ছিল যে, দিব্যভাব লেখা সমাপ্তকালে ভক্তসমাজে প্রচার করিবেন। বিধিনির্বন্ধে পুনরায় আমার নিকট আসায়, আমি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিতেছি।

…আচার্যপাদ নরঋষি নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) যিনি আমাদের শিরোমণি এবং যাঁহারই প্রসাদে আমরা অচিন্ত্যচরিত প্রভুর মহিমা যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহার ধর্ম মীমাংসা এবং রামকৃষ্ণ-দর্শন ব্যাখ্যার প্রারম্ভে সেই মহাশক্তিরই উপাসনা করিতেছেন।][1]

In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ এক রকমের গঠন। যেমন ক্ষুদ্র আত্মা চেতন শরীরে আবৃত, সেইরূপ বৃহৎ বিশ্বাত্মা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি, বাহ্যজগতে আবৃত; শিবোপরি শিবা—কল্পনা নহে; যেমন—মনের ভাব এবং অক্ষর বা কথা ভেদ করা যায় না, একের অন্য আবরণ—সেইরূপ। কল্পনা দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিয়া বলা যায় মাত্র। কেহ কথা বিনা চিন্তা করিতেও পারে না। অতএব In the beginning there was the word, and the word was with God and the word was God.

বিশ্বাত্মার এই প্রকাশভাব অনাদি অনন্ত। অতএব নিত্য সাকার ও নিত্য নিরাকার মিলিয়া আমরা জানি দেখি ইত্যাদি।

অথ ধর্ম মীমাংসা

১। দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন মানুষ্যের সহিত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছে। এই মুহূর্তে যেথায় আছে, পরমুহূর্তে সেই স্থান হইতে অন্যত্র নীত হইতেছে।

২। এই নিরন্তর পরিবর্তন অন্তর্জগৎ ও বাহ্যজগৎ উভয়েই হইতেছে।

৩। এই নিয়মের অধীনে প্রতি পত্র, শিরা ও পল্লব, এবং তাহাদের সমষ্টি-স্বরূপ বৃক্ষ। প্রতি শরীর, মন ও আত্মা ও একপ্রকার বহু মনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে।

৪। এই প্রকার বহু সমাজের সমষ্টিস্বরূপ এই মনুষ্য-জগৎ।

৫। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কতকগুলিকে আমরা শুভ এবং কতকগুলিকে অশুভ মনে করি। (পূর্বপক্ষ হইতে পারে, শুভাশুভ কি? এবং যথার্থ বোধ কি না?)

১ বন্ধনী-চিহ্ন বর্তমান লেখক প্রদত্ত। এই অংশে 'দিব্যভাব' অর্থে লীলাপ্রসঙ্গের 'দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ' পর্ব।

প্রস্তাব, মনুষ্যকে হিতাহিত, শুভাশুভ, উত্তমাধম জ্ঞানবিশিষ্ট জীব সিদ্ধান্ত করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

৬। ঐ সকল পরিবর্তনের মধ্যে, সৃষ্টি-বোধ, পরলোক-বোধ এবং কর্ম-বোধ-জনিত যে সকল মানসিক পরিবর্তন সমষ্ট্যাকারে বিস্তাররূপে কার্যে পরিণত হইয়া মনুষ্যের জীবনে এবং সমাজে অন্য সর্বপ্রকার অনুভূতি ও অনুমান অপেক্ষা অধিকতর পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে, তাহার নাম ধর্ম।

৭। পদার্থ দ্বারা, বস্তুগত ধর্ম দ্বারা, অদৃষ্ট দ্বারা, পুরুষদ্বয়ের সংঘর্ষ দ্বারা সর্বশক্তিমান একমাত্র আত্মা দ্বারা, এবং জানি না আরও কত প্রকারে এই জগতের উৎপত্তি অনুমিত হইয়াছে। অবশ্যম্ভাবী ফল, ঈশ্বরানুগ্রহে খণ্ডিতব্য ফল, স্বাধীন, ঈশ্বরাধীন, অদৃষ্টাধীন, ইত্যাদি বহু প্রকারের কর্মের ফল অনুমিত হইয়াছে, এবং এই সকল বিভিন্ন অনুমানের ফলস্বরূপ বিভিন্ন ধর্ম হইয়াছে।

৮। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন, উচ্চ-নীচ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়।

৯। প্রত্যেক ধর্ম অপরগুলিকে উপধর্ম ও ভ্রম মাত্র বোধ করেন। পূর্বে তরবারি দ্বারা, এক্ষণে যুক্ত্যাদি দ্বারা এই ভ্রম সংশোধিত হয়।

১০। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ী—এবং পণ্ডিতদিগেরও মত এই যে, মনুষ্যজাতি যে প্রকার নিম্নাবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় উঠিতেছে, সেই প্রকার ভ্রম হইতে সত্যে উঠিতেছে—যিনি যে মতটি মানেন, সেইটি তাঁহার সত্যের সীমা।

অথ রামকৃষ্ণদর্শনং প্রবক্ষ্যামি

নমো রামকৃষ্ণায়

১। যে প্রকার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরা ইত্যাদি অবস্থাসমূহের সমষ্টি একটি জীবন, সেই প্রকার সর্বমনুষ্যের সমষ্টি-স্বরূপ এই বিরাট মনুষ্যের অর্থাৎ মনুষ্য-জগতের একটি জীবন আছে। হইতে পারে ইহা সান্ত অথবা অনন্ত।

২। প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থা স্বরূপ।

৩। যেমন বৃদ্ধ যদি বলে—আমার বাল্যাদি অবস্থা অসত্য, তাহা হইলে যেমন উন্মত্ত-প্রলাপিত হয়, সেই প্রকার কোন বিশেষ ধর্ম অবস্থাগত মনুষ্যসমাজের অগ্রবর্তী অবস্থাকে অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বকে ভ্রান্ত বলা উন্মত্ত প্রলাপ।

৪। কারণম্ এব কার্যমনুপ্রবিশতি—কারণই কার্যস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়। হইতে পারে, পূর্ববর্তী কারণ কিছু নূতন পদার্থও গ্রহণ করিয়া কার্য হয়; তাহা হইলেও কারণটা তাহার মধ্যে থাকিল।

৫। অতএব প্রত্যেক পূর্ব অবস্থা পরের অবস্থার মধ্যে বিদ্যমান, প্রত্যেক পূর্ব ধর্মমত পর ধর্মমতের মধ্যে বিদ্যমান।

৬। অতএব যদি মনে কর, তুমি পূর্বের ধর্মবিশ্বাস হইতে উচ্চতর বিশ্বাসে আসিয়াছ, পূর্বের বিশ্বাসকে ঘৃণা করিও না; বরং ভক্তিভরে প্রণাম কর, তাহাও সত্য।

৭। ধর্মপরিবর্তন মিথ্যা হইতে সত্যতে গমন নহে। পরন্তু এক সত্য হইতে সত্যান্তরে গমন।

৮। যেমন আমরা কোন পোলে (খুঁটিতে) উঠিতে গেলে, নিম্নস্থান হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত স্থানে উঠি, কিন্তু এই সমস্ত স্থানের সমষ্টিই পোল। সেই প্রকার এই সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্য ধর্ম; এবং এই সকল ঈশ্বরভাবের সমষ্টিই ঈশ্বর।

৯। অতএব প্রত্যেক ধর্মই সত্য, এবং পরে যে সকল ধর্ম সমাজে বিস্তৃত হইবে, তাহাও সত্য।

১০। অতএব ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, অব্যয়, এবং আরও কত কি তা জানি না।

১১। এই পৃথিবীলোকে যত ভাব হইয়াছে, এবং সম্ভব, এবং অনন্ত জগতে যত হইবে, এবং অন্যান্য লোকে যত আছে এবং সম্ভব; ভূলোক, দ্যুলোক এবং অনন্তলোকে যত রূপ আছে এবং হওয়া সম্ভব; এবং ভাব, রূপ, গুণ, যে প্রকার মনুষ্য জীবের মানসিক বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হয়, সেই প্রকার উচ্চতর এবং তম চিদাত্মা জীবসমূহে যদি থাকে, এবং তাহাদের মানসিক বৃত্তিতে, যদি আরও কত প্রকারের মনুষ্যের জ্ঞান এবং কল্পনাতীত ভাবাদি থাকে; এই সকলের সমষ্টি বিরাট পুরুষের নাম ঈশ্বর।

১২। পূর্বপক্ষ—ঈশ্বরে তাহা হইলে স্বরূপ ব্যাঘাত, সগুণ ব্যাঘাত ইত্যাদি দোষ কি বর্তমান?

১৩। ভীত হইও না, ধীরভাবে পর্যালোচনা কর, মনে কর—একটি শক্তি কোন একটি বস্তুর উপর গতিকর্মের চেষ্টা করিতেছে,—কেবল একটি, তাহা হইলে গতি অসম্ভব। ইহা নিশ্চিত, ততোধিক শক্তি এক নির্দেশে কার্য করিলেও হইবে না; কিন্তু বিভিন্ন অর্থাৎ ব্যাহতভাবে কার্য করিলে হইবে, (Contrary and Contradictory)। অপিচ প্রত্যেক শক্তি ঠিক তাহার প্রতিরূপ প্রতিঘাত শক্তির দ্বারা ব্যাহত হয়, ইহাও সত্য। (3rd law of Newton)।

১৪। সমস্ত জগৎ চলিতেছে।

১৫। অতএব বিশ্বময় এই ব্যাঘাত বর্তমান; এবং ইহাই বিশ্বের জীবন।

১৬। জীবন কি? প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু।

১৭। যে মহাশক্তি ব্যাঘ্রের হননেচ্ছার স্রষ্টা, তাহাই হরিণের পলায়নেচ্ছার স্রষ্টা নতুবা বহু-ঈশ্বর-প্রসঙ্গ দোষ হয়।

১৮। প্রত্যেক মনেতে কি কাম, শান্তি, ক্রোধ, প্রীতি ইত্যাদি বিপরীতের যুগ্ম বর্তমান নহে?

১৯। অতএব পূর্ব পূর্ব ধর্মসকল এক শ্রেণীর কার্য এবং তাহার কারণ কেবল পর্যালোচনা করিয়াছে; অপরগুলি করে নাই।

২০। পূর্বপক্ষ—এক শ্রেণীর কার্য যে প্রকার দয়া, ধর্ম ইত্যাদি যথার্থ সৎ, অপর শ্রেণী—অর্থাৎ পাপ ইত্যাদিই মায়িক সত্তা অর্থাৎ তাহার অভাবমাত্র।

২১। উত্তর—তাহা হইলে আমাদেরও উল্টাইয়া বলিবার অধিকার আছে; যথা পাপই সত্তা, পুণ্যাদি মায়িক।

২২। সত্তা উভয়েই সমান, কার্য উভয়েরই এক প্রকারের। অতএব কারণও এক প্রকারের।"

* * * *

'রামকৃষ্ণ-দর্শনে'র প্রথম প্রবক্তা যে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং—এ তথ্য আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তার একটি সূত্রাকারে হলেও নির্দিষ্ট রূপও যে তিনি দিয়ে গেছেন, সে সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অমরা অনবহিতই ছিলাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই লেখাটির প্রামাণ্য নিয়ে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালের আন্তরিক আনুগত্যের কথা মনে রেখে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এক্ষেত্রে কোনো সংশয়েরই করণ নেই। তাছাড়া, উদ্ধৃত সূত্রগুলির ভাব এবং ভাষাও বিবেকানন্দ-সাহিত্যের অনুগামীদের কাছে সুপরিচিত। স্বামীজীর সন্ন্যাস-জীবনের সূচনাপর্বে পরিব্রাজক-অবস্থায় লিখিত এই রামকৃষ্ণ-দর্শনের সূত্রাবলী সাহিত্য ও দর্শন উভয় জগতের পক্ষে পরম মূল্যবান। তবে প্রত্যক্ষ স্বামীজীর হাতের লেখায় এটির উদ্ধার এখন প্রায় অসম্ভব। সান্ন্যালমশাই যে এর অনুলেখনটি ভবিষ্যৎ পাঠকদের জন্য সযত্নে রক্ষা করেছিলেন, সেজন্য তিনি বিশ্ববাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মননের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামীজীর 'My Master'[1] (মদীয় আচার্যদেব) বক্তৃতাটির অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।—"আমার গুরুদেবের কাছে আমি আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের—একটি অদ্ভুত সত্যের—শিক্ষালাভ করেছি। তাঁর এই কথাটিই আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় যে, জগতের ধর্মসমূহ পরস্পর-বিরোধী নয়। সব

১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ৮ম খণ্ড; রচনাটি আসলে ২টি বক্তৃতার মিলিতরূপ।

ধর্ম সেই এক সনাতন ধর্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ। এক সনাতন ধর্মই চিরকাল রয়েছে ও থাকবে, আর এই ধর্মই বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশমান। অতএব আমাদের সব ধর্মকে সম্মান করতে হবে, আর যতদূর সম্ভব সবগুলিকেই গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে ধর্ম বিভিন্ন হয়, তা নয়; ব্যক্তি হিসাবেও ধর্ম বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোনো ব্যক্তিতে ধর্ম তীব্র কর্মরূপে প্রকাশিত, কারও ভিতর গভীর ভক্তিরূপে, কারও ভিতর যোগরূপে, কারও ভিতরে বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তোমার পথ ঠিক নয়, একথা বলা ভুল। 'সত্য একও বটে, বহুও বটে'—এই মূল রহস্যটি শিখতে হবে, পালন করতে হবে। বিভিন্ন দিক দিয়ে দেখলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্নভাবে দেখতে পারি। তাহলেই কারও প্রতি বিরোধের ভাব পোষণ না করে সকলের প্রতি আমরা অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হব।"[২]

ধর্মমত বা অন্যান্য মতামতের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে দ্বন্দ্বের অধিকাংশ কারণই মানব-মনের বিভিন্ন স্তর ও ইতিহাস বিচার না করে নিজের নিজের মত অন্যের, সমাজের বা জাতির ঘাড়ে চাপাবার অপপ্রয়াস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের জাতীয় আত্মোপলব্ধির মূলে অধ্যাত্ম-চেতনার ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে সমন্বয়-মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর বহু সমস্যাকীর্ণ স্ববিরোধী চিন্তার পরিমণ্ডলেও সেই সমন্বয়-সাধনার আদর্শ আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির অন্তশ্চৈতন্যের সামঞ্জস্য আজ যতটা অপরিহার্য, পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে আর তা কখনো ছিল না। কিন্তু সব দেশ ও জাতিকে এক ধর্ম, এক ভাষা, এক বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ করা সে সমস্যার সমাধান নয়, প্রত্যেক দেশ ও জাতির স্বধর্মে স্থিতি এবং অন্যজাতি ও ধর্মের সঙ্গে সমন্বিত হওয়ার প্রয়াসই আধুনিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল আদর্শ হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের এই মৌল সত্যটি বিবেকানন্দ-সান্নিধ্যে এসে নিবেদিতা যেভাবে বুঝেছিলেন, সেকথা তাঁর The Web of Indian Life গ্রন্থের 'The Synthesis of Indian Thought' (ভারতীয় চিন্তাধারায় সমন্বয়) প্রবন্ধের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্মরণীয়—"জাতীয় প্রগতির ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী রামকৃষ্ণ পরমহংসের মাধ্যমে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল; রামকৃষ্ণ পরমহংস—এই নামটি যাবতীয় সম্ভাব্য আদর্শ ও সমস্ত ধরণের চিন্তাধারার সমন্বয়ের প্রতীক। হিন্দুধর্ম ও মহাজীবনে শাঙ্কর-দর্শনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছে. আর সেইসঙ্গে, যে কোনো একটি আদর্শ বা পন্থাই

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৮ম খণ্ড : পৃঃ ৪০২

যে আত্মার ঈশ্বরোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট, সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এর পর থেকে হিন্দুধর্ম শুধু অপর ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই রইল না, সকল পন্থাকেই সঙ্গত জেনে গভীরতর প্রীতির সঙ্গে স্বাগত জানাল। সম্প্রদায় নয় সমন্বয়; বিশেষ কোনো উপাসনা-মন্দির নয়, অধ্যাত্মসংস্কৃতির এক বিশ্ববিদ্যালয়; বিশ্ব-ইতিহাসে পূর্ণতম ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশরূপে ভারতীয় মননধারা অবশেষে আপন সমগ্রতায় প্রকাশিত হল।"

প্রবন্ধটিতে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামের পাদটিকায় নিবেদিতা লিখেছেন—"কলকাতার বাইরে এক মন্দির-উদ্যানে ১৮৫৩ থেকে ১৮৮৬ অবধি রামকৃষ্ণ পরমহংস বাস করেছিলেন। তাঁর উপদেশাবলী এখনই এক বিপুল মননশীলতার শক্তিতে পরিণত হয়েছে।"[১] জাতীয় জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণমননের ভূমিকা শুধু অতীত ইতিহাসের ক্ষেত্রে নয়, বর্তমান যুগসমস্যার অনুধাবনেও স্মরণীয়। কিন্তু সাধারণত আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতটি ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র বর্তমানের গণ্ডিতে বাস করতে চান বলেই সামগ্রিক ইতিহাস-চেতনা হরিয়ে ফেলেন। বিশেষ কোনো মতবাদের আশ্রয়ে সভ্যতার আংশিক ব্যাখ্যামাত্র সম্ভব। মানব-মানসের বিভিন্ন স্তরের বৈচিত্র্যময় উপাদানের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বদেশ-চেতনার অনুধাবনই আমাদের করণীয়।

অদ্বৈতবেদান্তের উপলব্ধির সঙ্গে মানবিকতার সংযোগ-সাধনে শ্রীরামকৃষ্ণচিন্তাধারার মৌলিকতা-প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে যে বিশ্লেষণ করেছেন, এ ক্ষেত্রে তা প্রাসঙ্গিক। অদ্বৈতবাদী বেদান্ত যেখানে ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য এবং জগৎকে মায়া বলেছেন, সেক্ষেত্রে তন্ত্র শিব ও শক্তিতত্ত্বের দ্বারা সৃষ্টি বা মায়াকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন—"সেই মায়াকেও পরমতত্ত্বের অঙ্গীভূত করিয়াছেন।"[২]

ব্রহ্ম ও সৃষ্টি, স্থিতি ও গতি—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে মোহিতলাল তন্ত্রকেই সবচেয়ে অগ্রসর মনে করেছেন। "ভারতীয় দর্শন ও সাধনতত্ত্ব ওই দুইয়ের দ্বন্দ্ব নিরসনে যতগুলি পন্থা নির্মাণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে তন্ত্রের পন্থাই প্রশস্ততম, সৃষ্টিকে ইহার অধিক মর্যাদা দেওয়া ইতিপূর্বে আর সম্ভব হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম অতিশয় নূতন দিকে সেই পুরাতনকে ফিরাইলেন। তিনি গতি ও স্থিতিকে, জগৎ ও ব্রহ্মকে একই দেশে ও কালে অভেদরূপে বিদ্যমান দেখিলেন; শিব ও শিব-শক্তি, স্থিতি ও গতি, লয় ও সৃষ্টি একই তত্ত্বের এপিঠ ওপিঠ; গতির সঙ্গে স্থিতি, স্থিতির সঙ্গেই গতি অভিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে;

১ 'intellectual force'—এই শব্দটি মূল রচনায় ব্যবহৃত।

২ বাংলার নবযুগ : নবম অধ্যায় : বিদ্যোদয় সং (১৯৬৫) পৃঃ ১২২

একদিক হইতে দেখিলে যাহা ব্রহ্ম, অপর দিক হইতে দেখিলে তাহাই জগৎ। একটাকে পার হইয়া অপরটায় পৌঁছিতে হয় না, কেবল, সেই দৃষ্টি লাভ করা চাই—সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর উঠিতে পারিলে, ছাদ, সিঁড়ি ও নিম্নতল সবই একই বস্তু বলিয়া নিমেষে অন্তরগোচর হইবে। জড় বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যাইতে পারে—static ও dynamic—দুই-ই এক-শক্তির এককালীন স্ফূর্তি ; যে মুহূর্তে সৃষ্টি হইতেছে লয়ও সেই মুহূর্তে হইতেছে…। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ তত্ত্বত অভেদ—এই জগৎ-ব্রহ্ম অভেদ তত্ত্বের প্রতীক—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবিগ্রহ—তাঁহার সেই ইষ্টদেবতা 'কালী'।"[১]

মনীষী মোহিতলালের চিন্তাধারা সমর্থন করেই বলা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী-সংগ্রহ-পাঠে এ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে, আমাদের প্রচলিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে কিছু বক্তব্য তাঁর ছিল। সাম্প্রতিককালে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান ডঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Classical Indian Philosophies : Their Synthesis in the Philosophy of Ramakrishna বইখানি উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য—"…Sir Ramakrishna's philosophy is Samanvayi or Synthetic Vedanta, since it reconciles the different schools of Vedanta. But speaking more precisely, we are to say that it is the philosophy of neo-Advaita, neither Dvaita, nor Visistadvaita"[২] (শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন সমন্বয়ী বা সম্মেলনকারী বেদান্ত, বেদান্তের নানা চিন্তার মধ্যে তাঁর দর্শন সমন্বয়সাধন করেছে। কিন্তু আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে একে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত না বলে 'নব-অদ্বৈত' বলতে হয়।) দার্শনিক পরিভাষায় 'রামকৃষ্ণাদ্বৈত' নামকরণ চলতে পারে কি না পণ্ডিতেরা বিবেচনা করে দেখবেন।

ডঃ চট্টোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় আরো দেখিয়েছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য শঙ্করের মতো একমাত্র জ্ঞানকেই বড়ো করে দেখেন নি. ভক্তি, যোগ এবং কর্মকেও পরমসত্যলাভের পক্ষে সমান উপযোগী মনে করেছেন।[১] বাস্তবিক রামকৃষ্ণদেবের মতে, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক'। এদিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে জ্ঞান ও ভক্তির যে আপাতদ্বন্দ্ব—শ্রীরামকৃষ্ণ-

১ বাংলার নবযুগ : নবম অধ্যায় : বিদ্যোদয় সং (১৯৬৫) পৃঃ ১২৪।

২ Classical Indian Philosophies : Their Synthesis in the Philosophy of Ramkrishna : Dr. S. C. Chatterjee পৃঃ ১৪৯

১ Classical Indian Philosophies : Dr. Chatterjee পৃঃ ১৪১

সাধনায় ও বাণীতে তার সার্থক নিরসন। সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মতে এ যুগে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই ভক্তিযোগ শ্রেয় পন্থা—'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' কিন্তু তিনি এও বলছেন—'অদ্বৈতবাদ শেষ কথা।'

এযুগের ব্রাহ্মদের সাধনার সঙ্গে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে তিনি যখন সানাইয়ের পোঁ-ধরে থাকা ব্যক্তিটির সঙ্গে সুরের রংপরং তুলে নেওয়া ব্যক্তিটির তুলনা দেন, তখন ওই ভক্তির দৃষ্টিরই প্রসারিত ব্যাখ্যা। আবার কোনো জিজ্ঞাসু তাঁর কাছে এক কথায় অধ্যাত্মসত্য জানাতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।" কিন্তু তাঁর শিষ্যদের তিনি একঘেয়ে হতে বা মতুয়ার বুদ্ধি নিয়ে থাকতে বারণ করতেন। নরেন্দ্রনাথকে তিনি অদ্বৈত-সাধনার পথেও যেমন নিয়ে গেছেন, তেমনি 'মায়ের কাজ' করাবেন বলে নরেন্দ্রনাথের 'সমাধির ঘরে' চাবিও দিয়ে রেখেছিলেন। অনন্ত ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণই বলতে পারতেন, "তিনি অনন্ত, তাঁর পথও অনন্ত।"

স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ও মননে বহু বিচিত্র সাধন-পন্থার মিলন সম্বন্ধে যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন লীলাপ্রসঙ্গের 'সাধক ভাব'-খণ্ডে তা দ্রষ্টব্য। এর মধ্যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনুৎসুক বুদ্ধদেব ও তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য বিশেষ স্মরণীয়—'কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন, তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন. শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।"[১]

নরেন্দ্রনাথ তাঁর দুজন সঙ্গীকে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় তপস্যা করে এলে পর বুদ্ধদেবের 'নাস্তিক্য' প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—'নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে করে—তাই হওয়া, বোধ স্বরূপ হওয়া।' '…নাস্তিক কেন হতে যাবে? যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের

ভারতীয় সাধনপন্থার মধ্যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, এবং বহিরাগত ধর্মচিন্তার মধ্যে ইসলাম এবং খ্রীষ্টীয় সাধনা—এসব কটিই শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনায় মিলিত। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত

১ লীলপ্রসঙ্গ : সাধকভাব পৃঃ ৪০৫-৬

২ কথামৃত (৩য়) ১৮৮৬, ৯ই এপ্রিলের দিনলিপি।

অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ফল—কেবল বুদ্ধিগত চর্চার বিষয় নয়। শতাব্দীর সূচনায় রামমোহনের মননে যার অনুসন্ধানের সূচনা, শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে তার পরিপূর্ণ উত্তর। তরুণ ডিরোজিও ছাত্রদের কাছে ঈশ্বরের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন, তবু যে ঈশ্বরকে তিনি দেখেন নি, তাঁর সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশে বিরত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর ঈশ্বর-দর্শনের স্বীকৃতি দিয়ে তরুণ জিজ্ঞাসুদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতেন। তিনি দেখেছেন, শুধু তাই নয়, দেখাতেও পারেন। সাধারণে জীবনের শেষভাগে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে উপনীত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ আগে 'যো সো করে ঈশ্বর লাভ করে তারপর সংসার' করতে বলছেন। এককথায় তাঁর মতে, "মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" কারণ সেই সত্যেই মানব-অস্তিত্বের পরম সার্থকতা। অনাসক্ত ঈশ্বর-সংস্থিত হৃদয়ের পক্ষেই যথার্থ সেবা-ধর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব। তাই নরেন্দ্রনাথের সাধকজীবনের সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে নির্বিকল্প সমাধি। তাঁর 'জীবে প্রেম' সেই অদ্বৈতানুভূতিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ। 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' শ্রীরামকৃষ্ণ-ধ্যানে এক অখণ্ড অদ্বয় অনুভবে বিলীন। তা একই সঙ্গে চির পুরাতন, তবু যুগ থেকে যুগান্তরে চির নূতন হয়ে মানব-অন্তরের সব আপাত বিপরীতের সামঞ্জস্য সাধক। ব্রহ্ম ও জগৎ, সন্ন্যাস ও সংসার,—সত্যের এই বিভিন্ন রূপ ও স্তরের আপন আপন সার্থকতার স্বীকৃতি নিয়েই এ বিশ্বরূপ ব্রহ্মসত্তা শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসে উদ্ভাসিত। ভারতপ্রজ্ঞার ওই কেন্দ্রবিন্দুতে এ যুগের অধ্যাত্মচেতনার স্বাধিষ্ঠান।

* * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী ও ব্যক্তিত্বে এক সহজাত কবিত্বের অনুরণন রয়েছে, যুগে যুগে মরমিয়া সাধকদের কবিতায় ও জীবনে যার পরিচয় সহজেই মেলে। তাঁর কাছে যাঁরা যাতায়াত করতেন, তাঁরা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তিভাব-তন্ময়তাই বেশী লক্ষ্য করেছেন, ভক্তির অন্তরালে যে প্রাজ্ঞ মনীষার আকাশকল্প বিস্তার, তার প্রতি দৃষ্টি খুব কম লোকেরই পড়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের প্রসঙ্গ-আলোচনায় স্বভাবতঃই তাঁর জীবনে ও মননে ভারতবর্ষের 'বহু সাধনার ধারা' যেভাবে এক নবজীবনসত্যে অখণ্ডতা লাভ করেছে, সেকথাই স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী প্রচারের সর্বপ্রথম কৃতিত্ব অবশ্য কেশবচন্দ্রের। কিন্তু বিশ্বমানসের কাছে সে বাণী বহন করে নিয়ে যান স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর সে প্রয়াসের প্রভাব প্রথমযুগে দেখা দিয়েছিল ম্যাক্স মূলরের 'Ramakrishna ; His life And Sayings' গ্রন্থে। মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণার অতি সামান্য অংশই অনুবাদের মাধ্যমে আচার্য মূলর পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক বাণীর বিশ্বজনীন আবেদনেই তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্তব্য করেছিলেন—"If we remember that these utt-

erances of Ramakrishna recall to us not only his own thoughts, but the faith and hope of millions of human beings we may indeed feel hopeful about the future of that country. This constant sense of the presence of God is indeed the common ground on which we may hope that in time not too distant the great temple of the future will be erected, in which Hindus and non-Hindus may join hands and hearts in worshipping the same Supreme Spirit—who is not far from everyone of us, for in Him we live and move and have our own being." (ভূমিকা)

অবশ্য আচার্য মূলর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের যতটুকু পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'জ্ঞানী' মনে না হয়ে প্রধানত 'ভক্ত' মনে হওয়াই স্বাভাবিক—···he himself was a Bhakta, a worshipper or lover of the deity, much more than a Gnanin or a knower.........Ramakrishna was in no sense of the word an original thinker, the discoverer of a new idea or the propounder of any new view of the world. But he saw many things which others had not seen, he recognised the Divine Presence where it was least suspected, he was a poet, an enthusiast, or if you like, a dreamer of dreams,"[১] 'জ্ঞানী অপেক্ষা তিনি ছিলেন ভক্ত, পূজারী বা ঈশ্বরপ্রেমিক।···কোনো অর্থেই তিনি একজন মৌলিক চিন্তাশীল, নূতন আদর্শের আবিষ্কারক বা পৃথিবীতে নূতন মতবাদের প্রচারক নন। কিন্তু এমন অনেক কিছু তিনি দেখেছিলেন, যা অন্যেরা দেখে নি, এমন সামান্য কিছুর মধ্যে তিনি ভগবৎসত্তার প্রকাশ দেখতে পেতেন, যা অন্যেরা কল্পনাই করতে পারে না। তিনি ছিলেন কবি, পরমোৎসাহী অথবা যদি আপনারা পছন্দ করেন, তো বলতে পারেন

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীর আরো বিস্তৃততর আলোচনা তারপর থেকে হয়েছে, যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুটি কীর্তি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" (৫ খণ্ড) এবং স্বামী সারদানন্দজীর "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ" (৫ খণ্ড)। তাছাড়া অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত ইংরেজী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন,[১] রম্যাঁ রলাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী,[২]

১ Ramakrishna : His Sife and Sayings (১ম সংস্করণ) পৃঃ ৯৩-৯৪

১ The Life of Ramkrishna

২ The Life of Ramkrishna.
The Life of Vivekananda and the Universal Gospel,

(রামকৃষ্ণ-জীবনী রচনায় তাঁর অন্যতম প্রধান প্রেরণা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'The Face of Silence' নামে কবিকল্পনাময় রামকৃষ্ণ-অনুধ্যান-গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়), বাংলা সাহিত্যে আধুনিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ', ইংরেজী সাহিত্যের আধুনিক আন্দোলনের অন্যতম কৃতী ক্রিস্টোফার ঈশারুডের 'Ramakrishna and His Disciples' প্রভৃতি রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরাজি আলোচনা করলে একথাই মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই শ্রীমুখ-কথিত গল্পের মতো 'বহুরূপী'—তাঁকে যে যে দৃষ্টিতে দেখে তারই সপক্ষে অনেক বাণী ও যুক্তি সংগ্রহ করা যায়। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের মতে, "শ্রীরামকৃষ্ণকে বাইরে থেকে কেবল ভক্ত মনে হলেও ভিতরে তিনি পূর্ণজ্ঞানী....।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী থেকে আমরা স্বামীজীর এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন পাই। তবে মনে রাখতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শনে 'শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক'।

৩ Notes of some wondering the Swami Vivekananda Sister Nivedita.

চলচ্চিত্তম্ চলদ্বিত্তম্

ডঃ নন্দদুলাল গাঙ্গুলী

ভাষাজননী দেবভাষা কোন সুদূর অতীতে যে গম্‌ধাতুর উপর ক্বিপ্‌প্রত্যয় যোগে জগৎ শব্দের সৃষ্টি ও প্রচলন করে গেছেন সেকথা আমাদের জানা নাই। কিন্তু জগৎ আজও চলেই আসছে যদিও আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা জগৎকে স্থির বলেই মনে করি। এই চলমান জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বোধ হয় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান গৌতম বুদ্ধ দেহ, মন, প্রাণ এমন কি জগতের প্রত্যেক বস্তুকেই তাঁর গতিবাদ অথবা অনিত্যতা বাদের (Philosophy of Dynamism) অধীনে স্থাপন করে গেছেন। সেই সুদূর অতীতে বুদ্ধের এই চলমান দর্শন অথবা জগতের অনিত্যতাবাদ চিন্তা জগতে যে বিপ্লবের সূচনা করেছিল আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তার সত্যতার অনেকখানি স্বীকৃতি মিলেছে। জীব ও জড় জগতে অবিরাম সৃষ্টি, বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসলীলা লক্ষ্য করে তথাগত তাঁর অনিত্যবাদ (Philosophy of impermanuce) প্রচার করে গেছেন। তাঁর মতে স্থিতিশীল সত্তা অর্থহীন। জগতে সব কিছুই অনিত্য, গতিশীল ও ধ্বংসশীল। সব কিছুই স্রোতস্বিনী নদীর জলপ্রবাহ অথবা লেলিহান অগ্নিশিখার মতই চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। জগতে সৎ এবং অসৎ (Being and non-Being) কথাটিই গ্রহণযোগ্য নয়। সব কিছুই অনিত্য, চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীলতাই একমাত্র সত্য। জগতের এই নিয়ত পরিবর্ত্তন বা গতিশীলতার স্বীকৃতি হতেই বুদ্ধের নৈরাত্মবাদের উদ্ভবন।

সারাজীবনব্যাপী আমাদের দেহমনে নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘট্‌ছে—বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বহু সুখদুঃখ হাসিকান্নার দোলার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন স্রোত বয়ে চলেছে এবং এই প্রবাহ চলেছে এক নিরস্থিত অপরিবর্ত্তিত অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকে কেন্দ্র করে। কবির ভাষায় এই চিরযুবা, চিরজীবী চৈতন্যময় সত্তাকেই আমরা আত্মা (Self) বলে থাকি। গীতাও বলেছেন:

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কিন্তু এই জন্ম-মৃত্যু-রহিত, নিত্য শাশ্বত সত্তাকে অস্বীকার করে বুদ্ধদেব বললেন; অপরিবর্ত্তনশীল নিত্য আত্মা বলে কিছু নাই এবং কিছু থাকা সম্ভবও নয়। জগতে

সবই অনিত্য ও নিয়ত গতিশীল। একটি ঐক্যসাধক সূত্রের মাধ্যমেই আমরা মনিমালা বা ফুলমালা রচনা করি। কিন্তু বুদ্ধের মতে আমাদের মনের আঙ্গিনায় নিয়ত সঞ্চারমান ও বিলীয়মান যে ভাবরাশির উদ্ভব ও পরিসমাপ্তি ঘটছে তাদের ঐক্যসাধক কোন সূত্রের সত্তা নাই। তবে তাদের আসা যাওয়া চলছে Dependent Origination বা সর্ত্তাধীন সৃজন বাদের নিয়মে। পালি ভাষায় এই নিয়মের নাম হল পতিচ্চ সমুপ্পাদ আর সংস্কৃত ভাষায় প্রতীত্য সমুৎপাদ। তৎকালে প্রচলিত দুই একটি বিশিষ্ট মতবাদের সঙ্গে তুলনা করা হলে গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদ এবং এই প্রতীত্য সমুৎপাদ নিয়মের অর্থ সহজবোধ্য হবে।

সেকালে জগতের স্থিতি ও সত্তা সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। একটি ছিল নিত্যবাদ যার মতে বিশেষ বিশেষ সত্তা যথা আত্মা ছিল নিত্য, শাশ্বত এবং এই নিত্যতা কোন সর্ত্তসাপেক্ষ ছিল না। আর একটি ছিল নিরস্তিবাদ। নিরস্তিবাদীরা কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করতেন না। সৎ অসতের এই দ্বন্দ্ব অনেকসময় দুর্বিষহ হয়ে উঠত। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কল্পে বুদ্ধ প্রচার করলেন নিয়ত গতিবাদ বা পরিবর্ত্তনবাদ এবং এরই পরিণতি হল নৈরাত্মবাদ। সে সময়ে জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধেও দুইটি বিশেষ নিয়মের কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল। একটি হল accidentalism বা যদৃচ্ছাবাদ—যে মতে জগতের যে কোন বস্তুর উৎপত্তি আকস্মিক যে কোন কারণে হতে পারে। আর অন্যটি হ'ল Naturalism বা স্বভাববাদ। স্বভাববাদীরা বলতেন যে প্রত্যেক জিনিষের উৎপত্তি হল তার নিজস্ব স্বভাব অনুযায়ী। তৎকালে প্রচলিত এই কার্য্য-কারণ নিয়মের রাজ্যে ঈশ্বর বা অন্য কোন অনৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্ব এবং প্রাধান্যেরও স্বীকৃতি ছিল। বুদ্ধদেব যদৃচ্ছাবাদ এবং স্বভাববাদ এই উভয়বাদকেই অস্বীকার করলেন; এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বর এবং অন্য অনৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্বও অস্বীকৃত হল। আর বুদ্ধের প্রতীত্য সমুৎপাদের নীতি সেই স্থান অধিকার করল। এই নীতি অনুসারে বাহ্য বা মানসিক সমস্ত কিছুই কঠোর কার্য্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। সুশৃঙ্খল ও অপরিহার্য্য ধারাবাহিকতাকে স্বীকার করা হয়েছে এই নিয়মে। অর্থাৎ এই নিয়মে কারণ আবির্ভূত হল কার্য্য উৎপন্ন হতে বাধ্য। আর যেহেতু প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বতা কারণের উপর নির্ভরশীল সেজন্যই এই নিয়মকে সর্ত্তাধীন সৃজনবাদ (বা Dependent origination) বলা হয়েছে। এ নীতি হ'ল স্বয়ংক্রিয়। এখানে ক্রিয়া আছে কিন্তু কর্ত্তা নাই। কতকগুলি বস্তুর সংঘাত বা সমন্বয়ের উপরই প্রত্যেক কার্য্য নির্ভরশীল।

যখন এই কারণ মূলক বস্তুগুলির সংঘাত বা সমন্বয় ঘট্‌বে তখনই কার্য্যের ধারা বা তরঙ্গের উৎপত্তি হবে এবং কারণগুলির একটির অপসারণেও তরঙ্গ রুদ্ধ হয়ে যাবে —যেমন তৈল, পলিতা ও স্ফুলিঙ্গের সমবায়ে অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয় আর উহাদের একটির অভাব বা ত্রুটিতে অগ্নিশিখা স্তিমিত হয়ে যায়। এই নিয়ম অনুসারেই জগৎ চলছে এবং এখানে ঈশ্বর আকস্মিকতা বা অদৃষ্টের কোন স্থান নাই। জগতের সৃষ্টিবৈচিত্র্য এই কার্য্যকারণের উপরই নির্ভরশীল "কর্ম্মজম্ সৃষ্টি বৈচিত্র্যম্"। নৈরাত্ম্যবাদও এই প্রতীত্য সমুৎপাদ-এর উপর নির্ভরশীল এবং এই নিয়ম অনুসারে আত্মা হল দেহ, মন ও বিজ্ঞানের সংঘাত মাত্র। এই সর্ত্তাধীন সৃজন বাদের উপর কর্ম্মবাদ বা কর্ম্মফল বাদও নির্ভরশীল। এই নিয়মের উপরেই বুদ্ধের গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদ, এমন কি তাঁর মূলশিক্ষা "চত্তারি আর্য্য সত্যানি" অর্থাৎ দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে—এই চারিটি আর্য্য সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেইজন্য এই সর্ত্তাধীন সৃজন বাদকে বুদ্ধ 'ধর্ম্ম' হিসাবে গণ্য করেছেন।

বুদ্ধদেবের নৈরাত্ম্যবাদে শেষ পর্য্যন্ত আত্মা এবং পার্থিব সমগ্র বস্তুর নশ্বরতা বা অনিত্যতা স্বীকৃত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও রাজা মিলিন্দারের কথোপকথন একটি চমৎকার উদাহরণ। গ্রীক বংশোদ্ভব রাজা মিলিন্দা নৈরাত্ম্যবাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ভিক্ষু নাগসেন বিষয়টি সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্য রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন "মহারাজ আপনি কি পদব্রজে আগমন করলেন না রথে আগমন করলেন"? রাজা উত্তর দিলেন যে তিনি রথেই আগমন করেছেন। নাগসেন অতঃপর রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে মাস্তুল, বসিবার আসন অথবা রথচক্র ইত্যাদির কোন্ অংশকে রথ বলা চলে? কোনটিকেই নয়। কিন্তু সব অংশগুলির সংঘাত বা সমন্বয়-ই রথ। এইভাবে বিচার করে বৌদ্ধ দর্শনে নৈরাত্ম্যবাদের অধীনে মানবাত্মার সঙ্গে সঙ্গে জড়জগতের সমগ্র বস্তুকেই রাখা হয়েছে।

বুদ্ধের গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদ পরবর্ত্তীকালে ক্ষণিকবাদ (Doctrine of momentariness)-এ পরিণত হয়েছিল। কারণসমূহের সংঘাতে যে অস্থায়ী সত্তার আবির্ভাব হয় কালের স্রোতে তার স্থায়িত্ব একটি ক্ষণের বেশী নয়। ক্ষণেক পরেও যদি সেই সত্তার ছবি দৃষ্টিগোচর হয় তাহ'লে বুঝতে হবে এ সে জিনিষ নয় তারমত একটি জিনিষ (It is not the same but similar)। এই নৈরাত্ম্য-

বাদের ও ক্ষণিকবাদের ফলে আত্মা ও জগৎ কালের স্রোতে ধারাবাহিক প্রবাহে (series of flux) পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা চলমান ভাব প্রবাহ এবং সঞ্চরমান ঘটনা প্রবাহকেই আত্মা ও জড়জগৎ বলে ভ্রম করছি।

বুদ্ধের গতিবাদ সম্বন্ধে এইটুকু বলা যেতে পারে যে বুদ্ধ সত্তা (reality)কে অস্বীকার করেননি; তবে তথাকথিত স্থিতিশীল সত্তাকে গতিশীলতার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যাখ্যার সমর্থনে আজ ২৫০০ বছর পরে পদার্থ বিজ্ঞানী বলেছেন যে Reality is no more a static stuff, but radiant energy অর্থাৎ সত্তার স্থিতিশীলতা নাই আছে ভাস্বর শক্তিমত্তা। তবুও আমাদের মনে হয় যে এই ক্ষণে ক্ষণে বিলীয়মান গতিশীল সত্তার রূপকে ধরে রাখার জন্য অন্ততঃ আপেক্ষিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন আছে; অন্যথায় এই পারম্পর্য্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্বন্ধহীন অবস্থায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

যাই হোক অনিত্যতাবাদের ঋষি বুদ্ধের মূল শিক্ষা "চত্তারি আর্য্য সত্যানি" সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। জীবনে চরম দুঃখের নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধদেব যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের সাধনার নির্দ্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যেও ঈশ্বরের স্থান নাই। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল আটটি সৎনীতি এবং এই সৎনীতিগুলিই হল নৈতিক জীবনের ভিত্তি। বুদ্ধের নীতিধর্ম্ম অবশ্য সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আজও নৈতিক জীবনের ভিত্তি হিসাবে বুদ্ধের শিক্ষাই মানুষ গ্রহণ করার চেষ্টা করে চলেছে। সংসারে নৈতিক জীবনের ব্যবহারিক সার্থকতা যথেষ্টই আছে এমনকি একে অপরিহার্য্যও বলা চলে। কিন্তু ঈশ্বরবিহীন ধর্ম্মানুশীলনকে আধ্যাত্মিক তৃপ্তির অভাব অনিবার্য্যরূপে দেখা দিতে বাধ্য বলেই আমাদের ধারণা। আর আধ্যাত্মিক ও জড়জগতের যে ব্যাখ্যা গৌতমবুদ্ধ দিয়ে গেছেন তাঁর এই গতিবাদ ও নৈরাশ্যবাদের মাধ্যমে, তাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে—কাহার দুঃখ? দুঃখ নিরোধের সাধক কে? পুনর্জ্জন্ম কাহার? কর্ম্মফল ভোগকারী কে? আর মুক্তি বা নির্ব্বাণ কাহার প্রাপ্য? যাইহোক এই মূল তর্ক বিচারের কথা বাদ দিয়ে আমরা বিশ্বের এই প্রথম গতিবাদী বা অনিত্যতাবাদী দর্শনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এখন পরবর্ত্তী যুগের দর্শনৈতিহাসে গতিবাদের অনুসন্ধান করব।

গৌতমবুদ্ধের বহুদিন পরে আমরা গ্রীস দেশে দার্শনিক হিরাক্লিটাসের সন্ধান পাই। হিরাক্লিটাসের লিখিত পুঁথির কিছু কিছু ছিন্নাংশ (fragments) পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তার বিশাল গভীরতা অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য ছিল। মণীষী

সক্রেটিস তাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন যে হিরাক্লিটাসের চিন্তাধারার গভীরতা অতলস্পর্শী। এবং সে অতলে ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করতে হ'লে শক্ত ডুবুরীর প্রয়োজন। এই কারণেই অনেকের কাছে তিনি Heraclitus the Dark বলে পরিচিত ছিলেন। তিনিও তথাগতের মত বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে জগতের স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সৎ ও অসৎ এই দুই তত্ত্বকেই গতিশীল বা পরিবর্ত্তনশীল (Becoming) বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে জগতের আসলরূপ নদীর স্রোত বা অগ্নিশিখার মতই চলচঞ্চল, গতিশীল। একই নদীতে দুইবার স্নানকরা সম্ভব না, কারণ ক্ষণে ক্ষণে জলধারার পরিবর্ত্তন ঘটে যাচ্ছে। আর অগ্নিশিখাও পলে পলে তার ধ্বংস ও সৃষ্টির রূপের মাধ্যমে নিয়ত গতিশীলতা ও অখণ্ড পরিবর্ত্তনের কাহিনী যুগ যুগ ধরে ঘোষণা করে চলেছে। জগৎ স্থিতিশীল নয়। জগতে কোন বস্তুর-ই স্থায়িত্ব নাই। স্থিতি নয় গতিই চলেছে অনন্তের বুকে নৃত্যছন্দে পা ফেলে আর হয়ত পিছনে পড়ে থাকছে তথাকথিত বস্তুর বিলীয়মান অস্পষ্ট রূপরেখা—যাকে আমরা সত্তা বলে ভ্রম করছি।

হিরাক্লিটাস অবশ্য গৌতম বুদ্ধের ন্যায় প্রত্যেক বস্তুর বিকাশ, ধ্বংস বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও নিয়ত গতিশীলতার কারণ স্বরূপ বুদ্ধের "প্রতীত্য সমুৎপাদ" নিয়মের মত কোন নিয়ম উপস্থাপিত করেন নাই। তাঁর মতে বাহ্য (external) বস্তুর সংঘাত বা সমন্বয় এবং অভাব সৃষ্টি ও ধ্বংসের কারণ নয়। তিনি বলেন বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণের মধ্যেই ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। গ্রীসের মহাকবি হোমার দ্বন্দ্ব পরিহার করাই বাঞ্ছনীয় বলে গেছেন। সে সম্বন্ধে সমালোচনা করে হিরাক্লিটাস বলেন যে, মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিহার করার আবেদন জানাবার সময় কবি হোমার বুঝতেই পারেননি যে এভাবে তিনি জগতের ধ্বংসই কামনা করেছেন। তিনি বলেন "we must know that war is common to all and strife is justicc, and that all things come into living and pass away through strife" (frag. 62), অর্থাৎ আমাদের জানা প্রয়োজন যে যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব সকল স্তরেই বিদ্যমান এবং সংঘর্ষ বা দ্বন্দ্বই হল ন্যায়ের মানদণ্ড এবং সংঘটের মাধ্যমেই সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলা বল্‌ছে। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হ'ল সংঘর্ষই জড়িয়ে আছে সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অঙ্গে। একইতালে একইছন্দে জীবনমৃত্যুর নৃত্যলীলা চলেছে জগতের রঙ্গশালায়। এবং তিনি আরও বলেন যে "এই

বিরোধের মধ্যেও প্রচ্ছন্নমিলন প্রয়াসেই আছে চরম সার্থকতা"—"The hidden attunement is better than open one" (Frag. 47)।

হিরাক্লিটাসের বাণীতে নৈরাত্ম্যবাদের ভাব। নাই, বরং তিনি আত্মাকে সীমাহীন অনন্ত বলেই ঘোষণা করেছেন—"You will not find boundaries of soul by travelling in any direction, so deep is the measure of it" (Frag. 71)। হিরাক্লিটাসের ঈশ্বরবিশ্বাসও ছিল। তিনি একস্থানে বলেছেন "পরম সুন্দর মর্কট বা বানর যেমন মানুষের তুলনায় কদর্য্য পরমজ্ঞানী মানুষও তেমনি ভগবানের তুলনায় মর্কট তুল্য"—"The wisest man is an ape compared to God, just as the most beautiful ape is ugly compared to man" (Frags. 98, 99)।

অতীতের কথা বাদ দিয়ে বর্ত্তমান যুগেও আমরা জগতের সম্বন্ধে গতিবাদ বা অনিত্যতাবাদের সন্ধান পরই হিউম্, হেগেল, উইলিয়াম জেমস ও অন্যান্য অনেক দার্শনিকের চিন্তাধারায়। হিউম মন বা জড়বস্তু কোনটিকেই স্থিতিশীল বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে মন হল চলমান ভাবপ্রবাহ আর বস্তু হল সঞ্চারমান ঘটনা প্রবাহ। হেগেলের মতবাদকেও সীমিত অভিব্যক্তিবাদ বলাই উচিত। তাঁর আত্মা বা Absolute Idea বা পরম সত্তার যাত্রাক্ষণে মনে হল যে Nature বা প্রকৃতি বুঝি বা তার বিরুদ্ধপক্ষ (opposite); কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল পরম সত্তা প্রকৃতির বাহুবন্ধনে বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে অর্থাৎ স্ববিরোধিতার স্তর অতিক্রম করে পরম সত্তাই Nature বা প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিব্যক্তির পরের স্তরে দেখা গেল যে মানুষের আত্মচৈতন্যের মাধ্যমে প্রকৃতি বা প্রকৃতিরূপী পরম সত্তা আত্মসম্বিৎ বা আত্মসমৃদ্ধি ফিরে পেয়ে অধিকতর ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

আর উইলিয়াম জেমসের stream of consciousness এর কথা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু হিউম বা জেমসের পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই atomic beings বা অনুপ্রমাণ অসংখ্য সত্তাকে নিঃসর্ত্ত স্বীকৃতি দিলে আত্মা ও জড় জগতের ব্যাখ্যা সুচারুরূপে সম্ভব হয় না বলেই আমাদের ধারণা। যাই হোক গতিবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের আর একজন মনীষীর বক্তব্য একটু বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। তিনি এই গতিবাদ বা জাগতিক পরিবর্ত্তনশীলতাকে অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। বর্ত্তমানযুগের গতিবাদের এই পূজারী হলেন ফরাসী দার্শনিক বার্গস*। পরম সত্তার নিয়ত গতিশীলতা সম্বন্ধে তিনি Time and Free Will, Matter and Memory এবং Creative Evolution এই তিনখানি উপাদেয় গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে অতিস্বচ্ছ, সাবলীল ও কাব্যময় ভাষায় এই কঠিনতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই

দর্শন ও বিজ্ঞান জগতে theory of evolution বা অভিব্যক্তিবাদ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী এই অভিব্যক্তিবাদকে বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্র্যের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বলে স্বীকার করেও নিয়েছিলেন।

সুদূর অতীতেও লিউসিপ্পাস, এম্পিডকলস্, ডেমোক্রিটাস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি মণীষীর চিন্তাধারায় অভিব্যক্তিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এমনকি বুদ্ধেরও বহুপূর্ব্বে উপনিষদের সৎকার্য্যবাদ ও পঞ্চীকরণে, সাংখ্যের নৃত্যশীলা প্রকৃতির সৃজন প্রয়াসে এবং পুরাণের দশ অবতারের কাহিনীর মধ্যেও হয়ত অভিব্যক্তিবাদের সন্ধান মিলতে পারে। আধুনিক যুগে Darwin, Lamarck, Laplace, Spencer, Wiesmann, Schillar, Lloyd Margan, Bergson, Alexander প্রভৃতি মণীষীগণ অভিব্যক্তিবাদ বা ক্রমবিকাশ বাদের প্রধান প্রবক্তা। অভিব্যক্তিবাদের চিন্তাধারা বর্ত্তমানে যে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে সেগুলিকে সাধারণতঃ (১) Mechanical বা যন্ত্রবাদী (২) Teleological বা উদ্দেশ্যবাদী (৩) Creative বা সৃজনবাদী এবং (৪) Emergent বা উন্মেষবাদী আখ্যা দেওয়া হয়।

মণীষী বার্গস'র সৃজনবাদী চিন্তাধারা রূপ নিয়েছে প্রধানতঃ যন্ত্রবাদী ও উদ্দেশ্যবাদী ক্রমবিকাশবাদের সমালোচনার মাধ্যমে। সেজন্য এই যন্ত্রবাদী ও উদ্দেশ্যবাদী অভিব্যক্তি-বাদ সম্বন্ধে সামান্য আলোকদান করলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে Philosophy of Dynamism বা গতিবাদকে পরিবর্ত্তনবাদ, অনিত্যতাবাদ বা ক্রমবিকাশবাদ ইত্যাদি যে নামেই আমরা অভিহিত করিনা কেন Time বা কালই হল পরিবর্ত্তনের উৎস। আমরা সাধারণতঃ Time সময় বা কালকে Eternity, অনন্ত বা মহাকাল হ'তে বিচ্ছিন্ন করে ঘণ্টা, মিনিট, পল, বিপল রূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখ্‌তেই অভ্যস্ত। এই বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড সময়ের কিন্তু সত্যই কোন অস্তিত্ব নাই। এই abstracted বা বিমূর্ত্ত সময়কে আমরা Eternity বা মহাকালের নৃত্যছন্দ মনে করে নিতে পারলে আর এই দ্বৈতবোধের অবকাশ থাকেনা।

এইবার আসল বক্তব্যে আসা যাক। সাধারণতঃ Materialist ও Naturalist অর্থাৎ জড়বাদী ও নিসর্গবাদী দার্শনিকেরাই Mechanical Eavolution বা যন্ত্রবাদী অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী। যন্ত্রবাদ মতে জড়ই হ'ল দুনিয়ার পরম তত্ত্ব। Matter and motion জড় ও গতিই হল জগতের সব কিছুরই উৎপত্তির কারণ ও উপাদান। যন্ত্রবাদে বিশ্বাসী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ প্রাণ এবং মনকেও জড়ের জটিলতর ও জটিলতম প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ভাববাদী (Idealist) দার্শনিকগণ প্রাণ ও মনকে গুণগত পার্থক্যের জন্য জড়ের পর্য্যায়ভুক্ত বলে স্বীকার করেন না। আর রূপ, রস, গন্ধে ভরা এই

ধরণীর উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে যন্ত্রবাদী ব্যাখাও তাঁদের মনঃপুত নয়। এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ভাববাদীদের অভিমত হল যে একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, finality বা চরমতত্ত্বের আকর্ষণেই বস্তুসত্তার ক্রমবিকাশ ঘট্‌ছে এবং এই তত্ত্বকেই Teleological revolution বা উদ্দেশ্যবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জাগতিক পরিবেশ লক্ষ্য করলে এই চিরচঞ্চল জগতের গতির প্রতিছন্দে অভাবিতরূপে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ দেখা যায়। এই নিত্য নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কিছুই বলা যায় না—It is unpredictable ; সে জন্যই Bergson-এর মতে যন্ত্রবাদের সাহায্যে জগতের নিত্য গতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সৃষ্টির উন্মেষ ব্যাখ্যা করা চলে না। কারণ যন্ত্রবাদে আমরা দেখি যে মূল কারণ বা জড় প্রকৃতি অপরিবর্ত্তনীয় যান্ত্রিক নিয়মে নিজেকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করছে এবং প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছে, এই নিয়মে প্রত্যেক পরের স্তরের অভিব্যক্তি তার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং এর ব্যতিক্রম নাই। ফলে একই জিনিষের বারম্বার উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু প্রতিপদে নূতন সৃষ্টির ব্যাখ্যা Mechanical evolution বা যন্ত্রবাদ মতে পাওয়া যায়না।

এদিকে উদ্দেশ্যবাদ বা Teleological evolution ও Bergson-র মতে inverted Mechanism বা বিপরীত মুখী যন্ত্রবাদ মাত্র। নিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। প্রভেদ এই যে উদ্দেশ্যবাদে পরের স্তরই পূর্ব্বস্তরের নিয়ন্তা। সেজন্য বার্গসঁ বল্লেন যে, জাগতিক সৃষ্টিবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যার জন্য এমন এক ক্রমবিকাশবাদের প্রয়োজন যার মাধ্যমে এই নিয়ত-গতিশীল ও চলমান জগতের প্রতিটি অনিয়ন্ত্রিত, অভূতপূর্ব্ব, নূতন নূতন সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বার্গসঁ তাঁর প্রবর্ত্তিত ক্রমবিকাশবাদের নামকরণ করছেন Creative evolution বা সৃজনবাদ।

দৃশ্যমান জগতে পরম সত্তার প্রকাশকে কেন্দ্র করেই দর্শন ও কাব্যের সৃষ্টি। মণীষী বার্গসঁর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। "Bergson admits the reality of a whole which breaks into twain." আর Bergson নিজেও তাঁর Creative Evolution গ্রন্থে বলেছেন "The whole is of the same nature as the self", অর্থাৎ বার্গসঁর পরমসত্তা এক ও স্বয়ম্পূর্ণ এবং এই স্বয়ম্পূর্ণ-সত্তা হল মন বা আত্মার সমধর্ম্মী। এই পরম সত্তা যদিও এক, তথাপি তাঁর মতে জীবন ও জড় (Life and matter) সক্রিয় ও অক্রিয়-শক্তিধারার সংঘাত যার সমন্বয়রূপে এর প্রকাশ। এই জড়ের সঙ্গে আত্মার সংঘাতে যে জীবন ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার তিনি নামকরণ করেছেন Elan vital এবং আমরা তাকে প্রাণ-শক্তির প্রেরণাও বলতে পারি। বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত এই বন্ধন-

হীন, চৈতন্যময় জৈবশক্তি, elan vital, নিজের অভিব্যক্তির পথে দুর্ব্বার বেগে অনন্ত ধারায় ছুটে চলেছে আর আর ফেনিল উচ্ছ্বাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিত্য নূতন সৃষ্টির রূপরেখা বিশ্বের অঙ্গনে ফুটে উঠছে। এই চিরচঞ্চল প্রাণশক্তির স্বভাবকে বার্গসঁ আবার স্থিতিশীলও বলেছেন—"It is the nature of life to endure." এখানে endurance বা স্থিতিশীলতা শব্দটি তিনি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং সে অর্থ হল অতীতের স্মৃতিসঞ্চয় করে নিয়ে চলা—It is the nature of life to endure that is to carry its past along with it to remember ; অর্থাৎ এই নিয়ত গতিশীল প্রাণ শক্তি elan vital (ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধমান চলন্ত বরফ পিণ্ডের মত) অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে ছুটেছে অজানা অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে আর তার চলার তালে তালে ফুঠ্ছে সৃষ্টির নব নব ফুলরাশি।

Bergson এই নিয়ত গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল চৈতন্যময় প্রাণ শক্তিকে টাইম, কাল, বা সময় রূপে ও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি বলেছেন—Time is the very substance of reality—সময় বা কালই হ'ল পরম সত্তার মূল বস্তু। আর আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে এই চিরচঞ্চল প্রাণপ্রবাহকে তিনি duration অর্থাৎ গতি ও অতীতের স্মৃতি বা স্থিতির অন্তরঙ্গরূপে স্বীকার করে নিয়ে কাল প্রবাহ বলেই বর্ণনা করেছেন। এই টাইম বা সময় চিন্তনের সময় নয়, অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির সময়—This "time" is not conceptual time but time as experienced. এই Duration বা প্রবাহরূপে কালের বা time-এর স্থিতির মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কোন বিভেদ নাই। অতীত তরঙ্গমালা বর্ত্তমান তরঙ্গের সঙ্গে মিশে ছুটে চলেছে ভবিষ্যৎ তরঙ্গমালার বাহুবন্ধনে নিজেকে ধরা দেওয়ার আকাঙ্খায়। এই আদি অন্তহীন কাল প্রবাহ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নৃত্যশীল জড়-চৈতন্যের মিলনকেন্দ্র প্রাণ প্রবাহরূপে অন্ধ উন্মাদনায় সীমাহীন দিগন্তের দিকে ছুটে চলেছে। এ চলার কোন বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। আর এই চলার পথে হাউই বাজির বিচ্ছুরিত জ্যোতিকণার মত অজস্রধারে দিকে দিকে নূতন নূতন সৃষ্টির রূপায়ন হচ্ছে।

কাল ও নিয়ত গতিশীলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতাকে Bergson পরম সত্তাবলে স্বীকার করে নেওয়ায় Bradley মন্তব্য করেছেন—"If there is to be no supreme spiritual power which is above change, our spiritual interests are not safe guarded. But with any such power it seems to me nonsense to talk of the absolute reality of time" (*Essays on Truth and Reality* Foot Note—p. 250), অর্থাৎ আকস্মিক ঘটনা বা পরিবর্ত্তনের উপরে যদি কোন

বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের স্বার্থ-সুরক্ষিত হয় না; আর সেই শক্তিকে স্বীকার করা হলে কাল বা সময়কে পরম সত্তা বলা পাগলামীর নামান্তর হয়ে উঠে।

Bergson এর মতে এই পরম সত্তা, *elan vital* বা প্রাণতরঙ্গ বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য নয়, কারণ বুদ্ধির কাজ হল পূর্ণ সত্তাকে খণ্ড খণ্ড concept বা ধারণায় পরিণত করা এবং তারপর বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে খণ্ডগুলিকে পর পর সাজিয়ে পুনরায় পূর্ণতা সৃষ্টির (Synthesise) বিফল প্রয়াস। জীবন প্রবাহই হোক, আর জড়ের শক্তিপ্রবাহ হোক্ যে কোন গতিকেই বুদ্ধি (intellect) স্পন্দনহীন উপল খণ্ডের মত স্থিতাবস্থায় এনে দেয়। জড় বিজ্ঞানে বুদ্ধির দীপ্তির বিকাশ হয়ত সম্ভব, কিন্তু elan vital বা জীবনস্রোতকে বুদ্ধি অবরুদ্ধই করে থাকে। সেইজন্যই তিনি বলেছেন যে পরম সত্তা, elan বা প্রাণতরঙ্গের সামগ্রিকরূপে উপলব্ধি intuition বা সম্যক অনুভূতি দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু Bergson ভুলে যাচ্ছেন যে, বুদ্ধির সাহায্যেই তিনি বুদ্ধিকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আর intuition বা অনুভূতির জন্য যে স্থান তিনি নির্দ্দেশ করেছেন সে স্থানটিও বুদ্ধিরই সৃষ্টি।

যাই হোক আমরা এবার গতিবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে এসেছি। এ সম্বন্ধে আর দুই একটি তথ্যের উল্লেখ করে আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করব।

Dr. Radhakrishnan রবীন্দ্র দর্শনের এক স্থানে বলেছেন—"Being and Becoming, Stillness and Strife, are inseparable from reality" অর্থাৎ স্থিতি ও গতি বা পরিবর্ত্তন এবং শান্তি ও সংঘর্ষকে পরম সত্তা হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। সেই জন্যই চিরন্তন পরম সত্তার পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে, নানা সুরে ও নানা ছন্দে এই Being and Becoming, স্থিতি, গতি ও পরিণতির গান গেয়ে গেছেন। বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে কবির নটরাজ সৃষ্টির আনন্দে নানা ছন্দে নৃত্য করে চলেছেন। আর সেই নৃত্যে তালে তালে বিশ্বের রূপ "নিতুই নব" নিত্য নূতন হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশ্ব নাট্যশালায় লীলাচঞ্চল সৃজনলীলার পরম সত্তা কবির মানসচক্ষে বহু বিচিত্ররূপে দেখা দিয়েছেন। আর এই চিরন্তন সত্তার নিত্য গতিশীল চির চঞ্চল সৃজনলীলার উচ্ছ্বাস কবির অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে। কবির কাব্যে পরম সত্তার এই নিত্য গতিশীল ও পরিবর্ত্তন-শীল রূপরেখার সন্ধান পেয়ে অনেক মনীষী রবীন্দ্র দর্শনের সঙ্গে বের্গস'র দর্শনের তুলনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু'জনের ভাবধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা

দেখেছি যে বের্গসঁ পরম সত্তাকে এক, সয়ংপূর্ণ এবং আত্মার সমধর্ম্মী বলে স্বীকারও করেছেন। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির আগ্রহে তিনি এই সত্তাকে জড় ও চৈতন্যে বিভক্তও করেছেন। এবং তাঁর মতে জড় ও চৈতন্যের সংঘাতের পরিণতিই হল প্রাণপ্রবাহ। আর এই প্রাণ-প্রবাহ নিত্য নূতন সৃষ্টির তরঙ্গ বুকে নিয়ে ছুটেছে। এই চলার পথে বাধা নাই, শৃঙ্খলা নাই, নিয়ন্ত্রণ নাই।

এই সৃষ্টির শক্তি সন্ধানের আগ্রহেই বের্গসঁ অদ্বৈতকে দ্বৈত অর্থাৎ জড় ও চৈতন্যরূপে চিরন্তন করে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন। যদিও তিনি matter বা জড়কে congealed mind বা ঘনীভূত আত্মাও বলেছেন, তথাপি সক্রিয় চৈতন্য যাহাতে অক্রিয় জড় হ'তে শক্তি সঞ্চয় করে বিশ্বসৃষ্টির উৎসে পরিণত হতে পারে সেজন্য শেষ পর্য্যন্ত এই দ্বৈতবোধ ত্যাগ করতে পারেন নাই। তাঁর মতে এই জড় তত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের মিলন সঙ্গীত ভেসে চলেছে সৃষ্টি প্রবাহের বুকে আর সে সঙ্গীতে জড়িয়ে আছে অতীত স্মৃতির মূর্চ্ছনা। বের্গসঁর দর্শনকে inverted বিপরীত ধর্ম্মী সাংখ্য বলা চলে। সাংখ্যে জড় প্রকৃতি চৈতন্য পুরুষের সান্নিধ্যে তার নৃত্যছন্দে নব নব সৃষ্টি করে চলেছে আর বের্গসঁর দর্শনে জড়ের অন্তর্নিহিত শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে চৈতন্য প্রাণ শক্তির প্রবাহরূপে সৃষ্টির পশরা বুকে নিয়ে নৃত্যছন্দে অম্বরের পথযাত্রী হ'য়েছে। অবশ্য সাংখ্যে প্রকৃতির প্রাণ-চাঞ্চল্যের মধ্যে চির উদাস পুরুষের তৃপ্তি সাধনরূপ যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে বের্গসঁর দর্শনে সে উদ্দেশ্যবাদের বা Teleologyর স্থান নাই।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনের সঙ্গে বের্গসঁ-এর দর্শনের তুলনাই চলে না। রবীন্দ্র দর্শনে পরম সত্তা নিত্যগতিশীল এবং নিত্যপরিণামী বা পরিবর্ত্তনশীল নিশ্চয়ই; তবে সে চিন্ময়-সত্তা জড় ও চৈতন্য উভয়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন এবং উভয়কেই অতিক্রম করে নটরাজ-রূপে বিশেষ ভাঙ্গাগড়া খেলায় মেতে আছেন। নটরাজের সে খেলা সাধারণতঃ প্রবাহের রূপে নয়; তরঙ্গের রূপে নয়; নৃত্যের ছন্দে আত্ম প্রকাশ করেছে। সে নৃত্যের যে রূপ কবির চিত্তে ধরা দিয়েছে এবং সেখানে কবির অনুভূতি যেভাবে মুখর হয়ে উঠেছে তা হ'ল :—

মম চিত্তে নিতি-নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ
....
হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে
কাঁপে ছন্দে ভাল মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু, পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

আর ভরা ভাদরের বিপুল হাঁকডাক এবং অজস্র বচনের মাঝেও সেই নটরাজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে তার নৃত্যশীল মূর্ত্তি নিয়েই কবির মানস চক্ষে উদিত হয়েছেন।

পরম সত্তার নিত্য গতিশীল, চিরচঞ্চল প্রকাশ ভঙ্গী যেখানে প্রবাহিনী নদীর স্রোতের রূপে কবির চিত্তে ধরা দিয়েছে সে স্রোতের রূপও বিরাট, বিচিত্র এবং বিশ্বরূপেরই প্রতিচ্ছবি। সেখানে কবির কাব্যদর্শনের সঙ্গে বরং Prof. Samuel Alexander-এর দর্শনের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। বাস্তববাদী দার্শনিক আলেকজাণ্ডারের মতবাদ তাঁর Gifford Lectures "Space Time and Deity" নামক পুস্তকের দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আলেকজাণ্ডারের দর্শন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে সংক্ষেপে তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ করা গেল।

আলেকজাণ্ডারের মতবাদ হ'ল Emergent Evolution or উন্মেষবাদ। Theory of Relativity or আপেক্ষিকতাবাদ স্বীকার করে নিয়ে এবং পদার্থহীন আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের শেষপর্য্যায়ের ঘূর্ণায়মান প্রোটন, ইলেকট্রন ইত্যাদিকে জড়িয়ে নিয়ে আলেকজাণ্ডার Space-Time অর্থাৎ দেশকালকে আদি সত্তারূপে গ্রহণ করেছেন এবং তার সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতির সুন্দর বস্তুবাদী (Realised) দার্শনিক ব্যাখ্যা দেওয়াব চেষ্টা করেছেন। তাঁর আদি সত্তা Space-Time অর্থাৎ দেশকালকে তিনি pure motion বা শুদ্ধশক্তিরূপেও ব্যাখ্যা করে দেশকালকে স্থিতি-গতির সমন্বয়রূপে রূপায়িত করেছেন। এই স্থিতি-গতি Space-Time তাঁর চোখে একটি সমজাতীয় অনির্দ্দিষ্ট পদার্থ (Homogeneous stuff)। আর তার মধ্যে একটি ক্রিয়াশীল শক্তির কল্পনা করে তার নাম দিয়েছেন Nisus অর্থাৎ প্রেরণা। এই প্রেরণাকে সম্বল করে বিশ্বের আদি সত্তা space-time, দেশকাল, বা স্থিতিগতি অবিরাম অনন্তপূর্ণা বেগে ছুটে চলেছে পিছনে পর পর উন্নততর সৃষ্টির নজির রেখে। রূপহীন অনির্দ্দিষ্ট দেশকালের গতি বেগের প্রথম সৃষ্টি হল জড়ের পূর্ব্বাবস্থা। তার পর হল জড়ের প্রকাশ। তার রূপ, রস ও গন্ধাদি গুণরাশি নিয়ে। তারপর পর্য্যায় ক্রমে প্রাণ (life), চেতনা (consciousness) ও আত্মচৈতন্য (self-consciousness) এর আবির্ভাব ঘটল।

আলেকজাণ্ডারের এই বস্তুহীন space-time, দেশকাল বা স্থিতি-গতি দুর্ব্বার বেগে ছুটে চলেছে অনন্তের পথে। আর চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগে ওঠার মত প্রত্যেক ঘূর্ণনের গতিবেগে নিত্য নূতন ও উন্নততর সৃষ্টির উন্মেষ ঘটছে। এই সৃষ্টির ধারা মানুষ সৃষ্টি পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। কিন্তু গতির এখনও বিরাম নাই এবং এই উত্তালতরঙ্গের ন্যায় দুর্ব্বার গতি শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতম সৃষ্টি ভগবান (Deity)-র আবির্ভাবের অপেক্ষা রাখে।

চৈতন্যের সৃষ্টির পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই অনন্ত গতি-প্রবাহ চলেছিল অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে (unconsciously)। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সে গতিপ্রবাহ সজ্ঞানে চলেছে ভগবৎ সৃষ্টির প্রেরণায়। অবশ্য জড়বাদী এবং এক পরম সত্তায় বিশ্বাসী বাস্তববাদী আলেকজাণ্ডার জড়ের ক্রমশঃ জটিলতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নততর সৃষ্টির ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঠিকই। কিন্তু Space-Time, স্থিতিগতি বা দেশকালের আবর্ত্তনের ফলে যখন জীবন, চৈতন্য ও আত্মচৈতন্য সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন তখন ভুলে যাচ্ছেন যে, যে উপাদান নিয়ে সৃষ্টির পত্তন করেছেন তার থেকে পর পর অনেক বেশী দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। আর পরবর্ত্তী সৃষ্টির বা দত্ত পদার্থের গুণগত মৌলিক পার্থক্যের বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাঁর এ ব্যাখ্যা যত মনোমুগ্ধকর হোক গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া শক্ত। অবশ্য আলেকজাণ্ডার যে ক্রিয়াশীল শক্তি Nisus-এর সাহায্যে বিশ্ব রচনার চেষ্টা করেছেন সেই nisus বা প্রেরণাকে যদি আধ্যাত্মিকশক্তিরূপে গ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যা হয়ত সকলেরই গ্রহণযোগ্য হত। আর এক কথা তাঁর রচনায় ভবিষ্যতে ভগবৎসৃষ্টির আশা প্রকাশ মানুষের বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই আমাদের বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় সে ভুলের অবকাশ নাই। সৃষ্টির সর্ব্বস্তরেই ঔপনিষদিক একমাত্র পরমসত্তা সচ্চিদানন্দ রূপের চিরন্তন বিবর্ত্তনই কবির চিত্তে রেখাপাত করেছে। এই সত্তা space-time দেশকালের অতীত। বরং দেশকাল, স্থিতিগতি এই পরম সত্তার বিশাল বুকের মধ্যে শতদল হয়ে ফুটে উঠেছে।

যাইহোক আলেকজাণ্ডারের উন্মেষবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণের পাশে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব্ব কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনার উপসংহার করছি :

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে,
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে,
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে।
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্য চন্দ্র তারা যত
বুদ বুদের মত।

(বলাকা)

Statement about ownership and other particulars about the newspaper 'Darsan' to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of publication	Calcutta
2. Periodicity of its publication.	Quaterly
3. Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
Nationality	Indian
Address	20-2A, Haldar Bagan Lane, Calcutta-4
4. Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
Nationality	Indian
Address	20-2A, Haldar Bagan Lane, Calcutta-4
5. Editor's Name	Joint Editors :— (1) Sri Sibapada Chakrabarti
Nationality	Indian
Address	15-1, Surya Sen Street, Calcutta-12
	(2) Sri Pritibhusan Chatterjee
Nationality	Indian
	32, Beadon Street, Cal-6
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital.	Bangiya Darsan Parisad (A Cultural Association) 20-2A, Halder Bagan Lane, Calcutta-4 Bangiya Darsan Parisad 20/2A, Halderbagan Lane, Calcutta-4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

K. C Gupta
Signature of Publisher